গুঞ্জরণ

2024
2 DHAKA NORTH

"The scientific spirit is of more value than its products."

---Sir Jagadish Chandra Bose

BANGLADESH BIOLOGY OLYMPIAD
DHAKA NORTH

প্রচ্ছদের আলোকচিত্রঃ রিফা সানজিদা
জাহিন সুবহা

অঙ্গসজ্জা ও সম্পাদনাঃ জাহিন সুবহা
আব্দুল্লাহ আল আহসান আলভী
আল-মুকতাদির ইফতি

ভূমিকা

"কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষ স্বভাবতই জ্ঞান-পিপাসু। মানব মস্তিষ্ক সৃষ্টিশীল কাজের প্রতি সবসময়ই আকৃষ্ট হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত একবিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবী কল্পনাতীত। সারাবিশ্বে আজ বিজ্ঞানের জয়জয়কার। বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রায় বাংলাদেশের অবস্থান এখনো আশানুরূপ নয়। বিজ্ঞানের সব শাখায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহেরও তারতম্য লক্ষ্যণীয়। শিক্ষার্থীরা সাধারণত জীববিজ্ঞানের প্রতি একটি ভীতি পোষণ করে থাকে। অথচ বৈশ্বিক অতিমারী করোনা আমাদের জীববিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি তৈরির লক্ষ্যে গত এক দশক ধরে বিডিবিও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তার ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সাল থেকে আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এ বাংলাদেশ এর পক্ষে প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করে আসছে । বিডিবিও আঞ্চলিক জীববিজ্ঞান উৎসব এর বদৌলতে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল – কলেজ পর্যন্ত জীববিজ্ঞানের আলো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং এই ধারা প্রচলিত রয়েছে। বিশাল এই কর্মযজ্ঞের পেছনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে বিডিবিও এর নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক তথা এনজাইমরা ।

বিডিবিও ঢাকা উত্তর অঞ্চল হলো অন্যতম বৃহত্তর একটি অঞ্চল যারা প্রতিবছর সাফল্যের সাথে জীববিজ্ঞান উৎসব আয়োজন করে আসছে। বিডিবিও ঢাকা উত্তর অঞ্চলের এনজাইমদের উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে এই ম্যাগাজিন **গুঞ্জরণ** । যার প্রতিটি পাতায় ফুটে উঠেছে দক্ষ কর্মীদের নানা বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা ভাবনা, স্থিরচিত্র , অলিম্পিয়াডের টুকরো টুকরো মুহূর্ত।

আমি **গুঞ্জরণ** এর প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই, আশা করি এই ম্যাগাজিনটি সকল পাঠকের কাছেই সমাদৃত হবে এবং সবার ভালোবাসায় **গুঞ্জরণ** অচিরেই হয়ে উঠবে বিডিবিও উত্তর অঞ্চল পরিবারের ভবিষ্যৎ পথচলার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

মো: খালিদ বিন মোশাররফ

সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, ঢাকা উত্তর অঞ্চল ও

শিক্ষার্থী, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকদের জন্য ' **গুঞ্জরণ** ' বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এর পক্ষ থেকে একটি মহৎ প্রয়াস। আধুনিক এই যুগে গল্প , আর্টিকেল কোনো কিছুই আর পুস্তকভিত্তিক নেই। তবুও বই হোক বা ম্যাগাজিন বা খবরের কাগজ, হাতে নিয়ে পড়ার অনুভূতি আলাদাই। তাই আমাদের পাঠকদের জন্য ' **গুঞ্জরণ** ' একটি ছোট্ট উপহারই বলা যায়।

আর এই মহৎ প্রয়াসের ছোট্ট একটি অংশ হতে পেরে আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। আপনাদের কাছে একটি নির্ভুল ও আকর্ষণীয় ম্যাগাজিন প্রকাশ করাই ছিল আমাদের চেষ্টা। তবুও কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে মার্জনা করে বাধিত করবেন।

যাদের সৃষ্টিতে ' **গুঞ্জরণ** ' সমৃদ্ধ , তাদেরকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। অদূর ভবিষ্যতে ' **গুঞ্জরণ** ' এর সমৃদ্ধি ধরে রাখবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আব্দুল্লাহ আল আহসান আলভী
ব্যাচঃ ৮০
কৃষি অনুষদ,
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

আল-মুকতাদির ইফতি
ব্যাচঃ ৮০
কৃষি অনুষদ,
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

জাহিন সুবহা
ব্যাচঃ ৮১
কৃষি অনুষদ,
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

চীফ মডারেটরের বাণী

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। সারা বিশ্বের বিস্ময় আমাদের এই মাতৃভূমি । এদেশের মাটি, পানি, বাতাস আমাদের যেমন মানুষ করেছে, তেমনি তৈরী করেছে উদ্দীপ্ত জ্ঞান-পিপাসু ও বিদ্রোহী চেতনা। মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হলেও আজও বাংলাদেশ শিক্ষায় পিছিয়ে বহুলাংশে । প্রকৃত পক্ষে ব্যবহারিক ও কর্মমুখী শিক্ষার অভাব আমাদের শিক্ষার উন্নতির অন্তরায় । বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের দিকে এগোচ্ছে । বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদেরও শিক্ষায় সবার আগে দৃষ্টি দেয়ার বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটলেও বিজ্ঞান চর্চা এখনো পর্যাপ্ত নয় । অথচ বিজ্ঞান ব্যতীত বিশ্বের সাথে এক কাতারে দাঁড়ানো সম্ভবপর নয় । বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড (বিডিবিও) ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশে বিজ্ঞান প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সারা দেশে আঞ্চলিক জীববিজ্ঞান উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে দেশের সেরা মেধাবীদেরকে বাছাই করে জাতীয় জীববিজ্ঞান উৎসব আয়োজিত হয়। সেখান থেকে সেরাদের নিয়ে আয়োজিত হয় ন্যাশনাল বায়োক্যাম্প যার মাধ্যমে পুরো দেশ থেকে চারজন প্রতিনিধি বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত মেধাবীগণ দেশের ঝাণ্ডা বহন করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়। ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছরই এই বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে বাংলার তরুণরা অসামান্য সফলতা দেখিয়ে দেশের পতাকা সমুজ্জ্বল করে আসছে। দেশের এই মেধাবীদের বাছাইপ্রক্রিয়া মোটেও সহজ নয়। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রধান অবদান এই সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীদের, যাদেরকে 'এনজাইম' বলা হয়। সারাদেশের এনজাইমদের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ এগিয়ে চলে। তাই বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের সাফল্যের অংশীদার এনজাইমরাও।

বিডিবিও-এর সারাদেশের বারোটি অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ অঞ্চল ঢাকা উত্তর। প্রায় আড়াইশ এনজাইম প্রতিবছর এখানে অসীম কর্মস্পৃহার সাথে কাজ করে থাকে। এই অঞ্চল থেকে প্রকাশিত প্রথম ম্যাগাজিন **পত্রক** সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার দ্বিতীয় ম্যাগাজিন **গুঞ্জরণ** প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ছোটগল্প, সায়েন্স ফিকশন, ফটো-গ্যালারি ইত্যাদি দিয়ে সমৃদ্ধ এই ম্যাগাজিনের প্রকাশ সফলভাবে সম্পন্ন হোক সেই প্রত্যাশা থাকলো। সেই সাথে এই ম্যাগাজিনে যারা সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে একে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। আশা রাখি এই প্রকাশনটি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচিন্তার খোরাক যোগাতে ভূমিকা রাখবে।

ধন্যবাদান্তে

ড. জামিলুর রহমান

চীফ মডারেটর, বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ঢাকা উত্তর

অধ্যাপক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

উৎসর্গ

জুলাই'২৪ আন্দোলনে নিহত সকল শহীদের স্মৃতিতে.....

bangladesh biology olympiad
Dhaka North Region

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
লেখনী	
• বৃশ্চিক	১
• পৃথিবীর স্তব্ধতা এক সেকেন্ড !!!	৫
• অদৃশ্য লাইন	৭
• মাংসখেকো মৌমাছি	৮
• বিডিবিও এবং আমি	১০
• বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পিয়াডের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা	১১
• সুপারফুড স্পিরুলিনা	১৩
• স্কুল থেকে স্কুলঃ ক্যাম্পেইনের মজার এক অভিজ্ঞতা	১৬
• হরমোনের যত কথা	১৮
• শয়তানের নিঃশ্বাস	২০
• বিলুপ্তির পথে একসময়ের জনপ্রিয় ফল	২১
• জীববিজ্ঞান	২৩
• খাদ্য	২৪
ফিরে দেখা	
• RBO 2024	২৫
• NBO 2024	২৭
চিত্রকল্প	৩০
মুঠোফোনে প্রকৃতি	৩৩
অঙ্কন	৩৮

বৃশ্চিক

এক

মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় গত মাসের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে জেগে ওঠা ছোট্ট দ্বীপ নিয়ে দেশবাসীর কৌতুহলের শেষ নেই। কিন্তু তার চেয়েও বেশি কৌতুহল জন্মেছে বিজ্ঞানীমহলে। বিশেষ করে কীটতত্ত্ববিদ, অনুজীববিদ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মাঝে কৌতুহল সবথেকে বেশি। এর পেছনে এই দ্বীপের অনোন্য জীববৈচিত্র্যই একমাত্র দায়ী না, এর মাঝে পাওয়া একটি জীবের দেহাবশেষ অনেকাংশে দায়ী। ইতোমধ্যে এখানে তিনটি বিভাগেরই বিজ্ঞানীগণ উপস্থিত হয়েছেন নিজেদের দলবল নিয়ে। ভোলা-দ্বীপে সমুদ্রের কোল ঘেষে সরকারী উদ্যোগে স্থাপন হয়েছে ছোটখাটো একটি আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, যেন দ্বীপটি থেকে নেয়া স্যাম্পল দ্রুত এখানে এনালাইসিস করা যায়। উদ্ভিদবিজ্ঞানী ড. আবেদ আলী, অনুজীববিদ ড. প্রামাণ্য রায় ও কীটতত্ত্ববিদ ড. মহসীন চৌধুরীর নেতৃত্বে তিনটি দল এখানে প্রায় বিশ দিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এবং যতই কাজ এগোচ্ছে ততই বিতর্ক বেড়ে চলছে এই জীবটি নিয়ে। ট্যাক্সনোমিতে আজ অবধি জীবটিকে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। মজার ব্যাপার হলো, ট্যাক্সনোমির কোথায় একে স্থান দেয়া যায় তা নিয়েই বিতর্কের সীমা নেই।

জীবটিতে একাধারে উদ্ভিদ, পোঁকা ও ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এতে উদ্ভিদ কোষের মতো ক্লোরোপ্লাস্ট আছে, আবার ছত্রাকের মতো কাইটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর আছে। সবথেকে উদ্ভট ব্যাপার হলো, এই এককোষী জীবটিতে ছয়টি পায়ের মতো উপাঙ্গ আছে যা দিয়ে এটি চলতে পারে! আজ মিটিং শেষে এই বিশেষ জীবটিকে আরো বিশদভাবে জানার জন্য একজন জেনেটিক্স এক্সপার্ট ডেকে আনার সিদ্ধান্ত হয়। সদ্য টেক্সাস থেকে পিএইচডি করে আসা শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ড. মারুফ খানকে এই কাজের দায়িত্বে ডেকে আনা হয়। বত্রিশ বছর বয়সে দুটো মাস্টার্স এবং মলিকিউলার জেনোমিক্স ও মাইক্রোবায়োলজির গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে ইতোমধ্যে তিনি দেশে বিদেশে সারা ফেলে দিয়েছেন। তবে শুধু মেধার জন্যেই তাকে ডাকা নয়, তার আরেকটা বিশেষ পরিচয় আছে। বত্রিশ বছর বয়সের এই দেহে মেদ চর্বির পরিমাণ নেই বললেই চলে। থাকবেই বা কি করে, তার দিনের চব্বিশ ঘণ্টার অন্তত এক ঘণ্টা সময় কাটে সাঁতরে।

বাংলাদেশের একসময় অনুর্ধ ২১ রানার্স আপ ছিলেন। এবং ড. মারুফের এই মিশনে সাঁতারের গুরুতর প্রয়োজনীয়তা আছে।

মারুফ এসে পৌঁছেই কাজে নেমে পড়েন। সবগুলো রিসার্চ ডাটা চেক করে একটি মিটিং আয়োজন করেন।

মারুফ: স্যার, আপনাদের কাজগুলো পড়লাম সবই। বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এর নিউক্লিয়াসের গঠনও আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে।

আবেদ: জ্বী, তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এখন পর্যন্ত আমরা এদের কোনো জীবন্ত স্যাম্পল পাইনি।

প্রামাণ্য: আমার কাছে মনে হচ্ছে এরা একা একা বাঁচে, কলোনি নিয়ে থাকে না।

মারুফ: হুম, কিন্তু এদের উপাঙ্গগুলো এরা নড়ায় কি করে? কোনো সিগন্যালিং মেকানিজম পেয়েছেন?

মহসীন: এখনপর্যন্ত যা বুঝেছি, এদের এনজাইম দিয়েই এই কাজটি করে। কিন্তু জীবন্ত স্যাম্পল পেলে আরো ভালোভাবে দেখা যেতো।

সামনে রাখা একটি ম্যাপের একটি জায়গায় আঙুল রেখে মারুফ বললো. "আপনাদের দেখানো ম্যাপ অনুযায়ী এখানে এদের জীবন্ত স্যাম্পল পাওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। এই সমুদ্রের নিচে যেতে আপনাদের তো প্রফেশনাল ডুবুরি প্রয়োজন, কিন্তু আমাকে কেন?"

উত্তরটি দিলেন এই রিসার্চ প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান ও সকলের বয়োজেষ্ঠ্য, ড. মো. জসীম চৌধুরি। তিনি বললেন, "আপনাকে শুধু সাঁতারের দক্ষতার জন্য আনা হয়নি, এখানে শুধু এটুকুর বাইরে আরো কিছু আছে যা এখনপর্যন্ত আমরা কোথাও লিপিবদ্ধ করিনি সংগত কারনে।"

ঘর জুড়ে এখন এক শীতল নীরবতা নেমে এলো। সিনিয়র জুনিয়র সকল গবেষকরা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। অবশেষে ড. জসীম বললেন, "আমরা ধারনা করছি এই জীবটি একটি বিশেষ অভিযোজনের মধ্য দিয়ে এসেছে। যার ফলে এতে একাধারে উদ্ভিদ, কীট ও ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়েছে। আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন কার কথা বলছি.."

"কাইমেরা", মারুফ বলে উঠলো। "তাহলে বলতে হবে জীবটি অনেক স্মার্ট। আমরা এর একটি নাম দিতে পারি।"

প্রমাণ্য: অবশ্যই। জিনিসটি যেহেতু এখনো আমাদের কাছে

প্রমাণ্য: অবশ্যই। জিনিসটি যেহেতু এখনো আমাদের কাছে রহস্যে ঘেরা, আমরা একে নাম দিতে পারি জোডিয়াক সাইন অনুসারে বৃশ্চিক (Scorpio), কারন এটি রহস্য, গোপনীয়তা ও অভিযোজনের প্রতীক।

ড. জসীম: অসাধারণ। আমরা একে বৃশ্চিক বলেই ডাকতে পারি কোড নেম হিসেবে।

আবেদ সাহেব মারুফের দিকে ফিরে বললেন, "আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে মাত্র সত্তর বছর আগে ভূমিকম্পে একটি খাঁত তৈরী হয়েছে। আপনার গন্তব্য সেই খাঁতে। যদিও খাঁতটি খুব গভীর না, কিন্তু আমাদের বৃশ্চিকের আবাসস্থল হওয়ার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

মারুফ একটু চিন্তিত কণ্ঠে বললো, "এটাই প্রথম আমার সমুদ্রের নিচের কোনো খাঁতে নামা।"

ড. জসীম: আপনার সাথে প্রফেশনাল টীমও থাকবে। কিন্তু আপনার আসল কাজ হলো ভালো করে সব পর্যবেক্ষণ করা। আর যতো বেশি সম্ভব তথ্য ও জীবন্ত স্যাম্পল সংগ্রহ করা।

মারুফ: আমার একটি শর্ত আছে। আমাকে এই জীবন্ত স্যাম্পল থেকে কিছুটা দিতে হবে। আমি এদের জিনগত বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

ড. জসীম: অবশ্যই। যদি আসলেই প্রয়োজনীয় কিছু এখান থেকে পাওয়া যায়, তাহলে আপনি অবশ্যই এই রিসার্চে যুক্ত হতে পারবেন। বরং সরকারীভাবে আপনার রিসার্চ পরিচালনার জন্য সকল সাহায্য আমিই করবো।

আরো কিছু টুকটাক প্ল্যান সংক্রান্ত আলোচনা শেষে সকলে হ্যান্ডশেক করে আজকের মিটিং শেষ করলো। মারুফ তার ঘড়িতে দেখলো দুপুর তিনটে বিশ বাজে। সন্ধ্যা পাঁচটায় ডুবুরিদের সাথে তার আলোচনা হবে। তার আগের সময়টুকুতে সে দ্বীপটি একটি চক্কর দিয়ে নেয়ার প্ল্যান করলো। জুনিয়র একজন অনুজীববিদ, নাজনীন ফারজানা তার সাথে চলছে। মারুফের সাথে সুইমস্যুট দেখে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি এই ভরদুপুরে দ্বীপে সাঁতার কাটবেন নাকি?"

মারুফ জবাব দিলো, "সত্যি বলতে আমি দ্বীপে না, সমুদ্রে সাঁতারের প্ল্যান করছি। যাবেন নাকি স্পীডবোট নিয়ে সেই খাঁতের কাছাকাছি? একবার রেকি করে আসলাম।"

নাজনীন একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললো, "যাওয়া যায়, দাড়ান স্পীডবোট রেডি করতে বলি। আর হাঙরের পেটে চলে গেলে কিন্তু একা ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে মেরে ফেলবে এরা। এটা যেন না হয়!"

ভ্রমণসঙ্গী পেয়ে মারুফ চওড়া হাসি হেসে জবাব দিলো, "Sharks do love me, they don't bite!"

দুই

অবশেষে অভিযানের দিন চলে এলো। মারুফ সহ আরো চারজন ডুবুরি আছেন সমুদ্রের নিচে সেই খাঁতে। প্রায় পনেরো মিনিটের অভিযানের পরেও সেখানে আশানুরূপ কিছু পাওয়া গেলো না। সমুদ্রের এই খাঁতের কাছটায় দূষণ প্রচুর। নানারকম প্লাস্টিক ময়লা আবর্জনায় ভরপুর। ওদের দেখতেও রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে। মারুফ খাঁতের আরো নিচে যেতে আগ্রহী। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সাথে নেই। তাই সবাই উপরে ছোট্ট জাহাজটিতে উঠে এলো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারা নতুন অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলো । কিন্তু এবারো তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। সবই সাদামাটা জিনিস, বিশেষ কিছু নাই, দূষণ ব্যতীত। মারুফ আরো নিচে নামতে চাইলো। তবে সাথে থাকা সরঞ্জামের ধরন দেখে তাতে ডুবুরিরা সায় দিলো না। কিন্তু মারুফ একাই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

একটি রিমোট কন্ট্রোল সিগন্যালিং মেশিন নিয়ে সে আরো নিচে গেলো। এখনো তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে তার শরীরের ওপর কয়েক হাজার টন পানির চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। বেশিক্ষণ এভাবে থাকা যাবে না বুঝতে পেরে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলো। ঠিক এমন সময় কিছু একটা তার নজর কেড়ে নিলো। সামান্য আলোকিত কিছু!

সমুদ্রে আলোর দেখা পাওয়া দুর্লভ কিছু না। কিন্তু এমন সবুজ বর্ণের আলো সচারচর দেখা যায় না। আলোটি খুব দূরে না। কেমন যেন মারুফ মোহগ্রস্থ হয়ে গেল। সে এগোতে লাগলো আলোর দিকে। সে এগোতে লাগলো বায়োলুমিনেসেন্ট জীবগুলোর দিকে, বৃশ্চিকের দিকে!

এ যেন এক বিয়ে বাড়ির আলোকসজ্জা! জ্বলছে নিভছে আলো, সবুজ রঙের আলো। ভূতের চোখের মতো অন্ধকারে জ্বলছে নিভছে। হাত বাড়িয়ে বিশেষায়িত মিনি মাইক্রোস্কপে দিখলো, এই সেই বৃশ্চিক! মাইক্রোস্কোপের নিচে এদের নড়াচড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একেবারে জীবন্ত....

সে যত বেশি করে পারলো সাথে থাকা ভায়ালে এদের ভরে নিতে থাকলো। ছয়টি ভায়াল কিছুকক্ষণের মধ্যেই ভরে গেলো সবুজ আলোযুক্ত অদ্ভুত এই জীবে। কিন্তু পানির চাপের বৃদ্ধি আর অক্সিজেন লেভেলের হ্রাস কোনোটিতেই তার ভ্রুক্ষেপ নেই । তবে সে ঠিকই বুঝতে পারছে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বের হতে হবে। বের হওয়ার আগে এই জলজ্যান্ত নতুন প্রজাতির অদ্ভুত জীবটিকে একবার হাতে ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে সে দমাতে পারছে না। তাই কিছু না ভেবেই দ্রুত হাতের গ্লাভসটি খুলে নিয়ে খাঁতের দেয়ালে লেগে থাকা জ্বলজ্বলে জবুজ জিনিসগুলোয় হাত বুলালো। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছুই টের পেলো না। অগত্যা আবার গ্লাভস পড়ে নিয়ে শেষ ভায়ালটি ভরতে থাকলো। দ্রুত হাতে কিছু ছবি তুলতে শুরু করলো ও ভিডিও করতে লাগলো। অক্সিজেন লেভেলের দিকে এতক্ষণে তার নজর পড়েছে। যতটুকু অক্সিজেন আছে তা দিয়ে বড়জোর আর দশ মিনিট থাকা যাবে। এখান থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠে যেতেই তো তার অন্তত চার মিনিট লাগবে! তার মানে হাতে একদমই সময় নেই। তাকে বের হতে হবে এখুনি।

কিন্তু আচমকা তার চোখের সামনে সবুজ আলোর পাশাপাশি আরো লাল নীল বেগুণী হলুদ ইত্যাদি আলো জ্বলতে শুরু করলো। প্রথমবার চোখ পিটপিট করে ভালো করে তাকানোর চেষ্টা করেও কাজ হলো না। এখন তার মাথাও ভারী লাগছে, চোখের পাতায় যেন শক্তি কমে আসছে। নেশাগ্রস্থের মতো অনুভব হচ্ছে তার। কিন্তু সে তো কখনো মাদক গ্রহণ করেনি। তাহলে এমন লাগছে কেন? তাকে কি কিছু খাঁতের নিচের দিকে টানছে? হয়তো না, কারন হাতে পায়ে তো কিছু লেগে নেই যে তাকে টানবে। কিংবা স্রোতও স্বাভাবিক লাগছে। সে আর একটি নির্দিষ্ট জিনিসে ভাবনা আটকে রাখতে পারছে না। যেকোনো মুহূর্তে জ্ঞান হারানোর সম্ভাবনা আছে। কিন্তু জ্ঞান হারালে তার আর বেঁচে ফেরা চলবে না। যতটুকু চিন্তা করতে পারছে তা দিয়েই তার ইমার্জেন্সি সুইচ চেপে সিগন্যাল দিয়ে দিলো। এরপরই তার চোখ বুজে আসতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে সামনে।

তিন

ভোলায় সমুদ্রের তীর ঘেষে অস্থায়ী গবেষণাগার বানানো হয়েছে। সেখানে ইমার্জেন্সি মেডিকেল ফ্যাসিলিটির বেডে শুয়ে দুই দিন পর চোখ খুললো মারুফ। হাতে এখনো স্যালাইনের পাইপ লাগানো। চোখ খোলার কিছুক্ষণ পরই সেখানে সব সিনিয়র গবেষকগণ হাজির হলেন। তাদের দেখে মারুফ শুরুতেই জিজ্ঞেস করলো, "সেই ভায়ালগুলো কোথায়?"

ড. জসীম: আপনাকে উদ্ধার করার পরও আপনার জ্ঞান ছিলো, আর সেই মুহূর্তে আপনি শুধু একটি কথাই বলেছিলেন যেন ভায়ালগুলো কোনো অবস্থায়ই খোলা না হয়। আপনার সম্মানার্থে আমরা আপনার কথা অমান্য করিনি। এবার আপনি সুস্থ বোধ করলে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিন। সমুদ্রে সেদিন কি হয়েছিলো? আপনি অক্সিজেন থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞান হলেন কি করে? কেনো আমাদের ভায়ালগুলো খুলতে নিষেধ করেছিলেন?

মারুফ: Okey, too much questions at a time. কিন্তু বলছি আমি। আমার যতদূর মনে হয় আমি খালি হাতে স্পর্শ করায় এমনটা হয়েছিলো। সম্ভবত এরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য কোনো প্রকার নিউরোটক্সিন নির্গত করে। সেজন্য আমি এদের বাইরে বের করতে নিষেধ করেছিলাম। আমি আগে এই নিউরোটক্সিন নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করে দেখতে চাই।

প্রামাণ্য: আপনি কি জানেন আপনার শরীরে যে ধরনের টক্সিক পদার্থ পাওয়া গেছে তা অনেকটা কোকেইনের সাথে মিলে যায়?

মারুফ অবাক কণ্ঠে বললো, "তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং তো! আজপর্যন্ত মাদক নেইনি, এই কথাটা তাহলে আর কখনো বলতে পারবো না!"

উপস্থিত থাকা সিনিয়র ডাক্তার বললেন, "আপনি হালকাভাবে নিচ্ছেন ব্যাপারটা। আপনি আরেকটু হলে মারা পরতেন। আপনার রক্তে কোকেইনের পরিমাণ লিথাল ডোজের চেয়েও বেশি ছিলো। নেহায়েত ভাগ্য ভালো আর আপনার দেহের গড়ন ভালো বলে বেঁচে গেলেন এ যাত্রা।"

মারুফ এবার বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো। ড. জসীম বললেন, "আপনি বিশ্রাম করুন। সুস্থ হয়ে ল্যাবে ফিরুন। এরপর নিজেই ভায়ালগুলো খুলে প্রথমে পরীক্ষা করে দেখুন।"

মারুফ: জ্বী। এখানে আমার এখনো কিছু জিনিস জানা বাকি। আশা করছি সপ্তাখানেক সময় পেলে আমি বেশ কিছু রহস্য সমাধান করে ফেলতে পারবো।

এরপর সবাই টুকটাক কথা শেষে চলে গেলো। সেদিনকার সেই অনুজীববিদ নাজনীন বের হচ্ছিলো সবার শেষে। মারুফের চিন্তার ভাঁজযুক্ত চেহারা দেখে সে বললো, "কি ভাবছেন এতো? ভাবনা তো ল্যাবে এসেও ভাবতে পারবেন।"

মারুফ হাসতে হাসেতে জবাব দিলো, "আসলে ভাবছি আমার কি ল্যাবে যাওয়া উচিত নাকি রিহ্যাবে যাওয়া উচিত!"

নাজনীনও মুচকি হেসে বের হয়ে গেলো।

চার

ঠিক সতেরো দিন পর মিটিং হচ্ছে। জুনিয়র সিনিয়র সকল গবেষক ও মারুফ সেখানে উপস্থিত। মারুফ এতদিন একাই দিন রাত কাজ করেছে। তার কাজের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী কাজ এগোবে। তাই সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মারুফের খুঁজে পাওয়া তথ্যগুলোর জন্য। অবশেষে মারুফ দাড়িয়ে বলতে শুরু করলো, "সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে কাজের সুযোগ দেয়ার জন্য। আসলে কোকেইনের টেস্ট করানোর জন্য আরেকবার ধন্যবাদ। তবে সেদিন আমি সরাসরি কোকেইন নেইনি। বরং তার চেয়েও ভয়ানক কিছু নিয়েছিলাম। সে ব্যাপারে বলছি। তার আগে আসি এর জেনেটিক্যাল গঠন নিয়ে।"

"সাধারণত আমার দেহে যতগুলো ক্রোমোজোম আছে বা জিন আছে তা একান্ত আমারই। এখানে অন্য কারো জিন পাওয়া যাবে না। কিন্তু কেমন হয় যদি আপনাদের কারো ডিএনএ টেস্ট করে পাওয়া তথ্য আপনার বাবা মার সাথে না মিলে অন্য কোনো জীবের সাথে মিলে? তখন আসলে আপনি ব্যক্তি হিসেবে আপনি হলেও জিনগতভাবে আপনি আপনি নন, অন্য কেউ! এই অদ্ভুদ ব্যাপারটি হলো কাইমেরা। সহজ কথায় একটি জীবের মধ্যে একাধিক জীবের ডিএনএ মিশ্রণ থাকা বা একটি জীবের মধ্যে একাধিক সত্তা থাকা। আমাদের এই বৃশ্চিকের বেলায়ও এটি ঘটেছে। তবে এরা দুটি নয়, বরং তিনটি সত্তা ধারন করে আছে , যেমনটি আপনারা আগেই ধারনা করেছেন। কিন্তু কেন? এবং কিভাবে?"

"আমার পাওয়া তথ্য মতে এদের বাসস্থানে এর উত্তর আছে। এই খাঁত তৈরী হয় সত্তর বছরেরও কম সময় হয়েছে। এর প্রাচীরগুলো আগ্নেয় শিলার মতো। অর্থাৎ এই স্তরটি আগে ছিলো অনেক গভীরে কোনো উত্তপ্ত অংশের কাছাকাছি।

সেখানে জীবের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। যারা বাঁচেও তারা প্রচণ্ড অভিযোজনক্ষম হয়। এরাও হয়েছে তাই। এরা পৃথিবী পৃষ্ঠে আসার পরপরই এককোষী ব্যাকটেরিয়া হওয়ায় দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি অর্থাৎ যোগ্যতমের টিকে থাকার লড়াইয়ে এগিয়ে গেছে। এরপর তুলনামূলক ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও দূষনে ভরপুর পরিবেশ পেয়ে নিজেদের জিন পুল বড় করতে চেয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে এদের মধ্যে যুক্ত হয়েছে সামুদ্রিক ফাঙ্গাস 'কাইট্রিড' (Chytrids) এর ডিএনএ, যাতে করে দূষিত পদার্থগুলোকে পঁচিয়ে খাদ্য হসেবে নিতে পারে। সাথে বোনাস হিসেবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে কাইটিনও পেয়েছে। সমুদ্র স্রোতের জায়গা। তাই স্থির থাকলে এদের শিকারের ব্যবস্থা করতে হবে । আর শিকারের জন্য দরকার আঁকড়ে ধরার আকর্ষি। সেজন্য তারা নিয়েছে 'ডাইনোফ্ল্যাজেলেট' (Dinoflagellates) নামক একটি মাইক্রোস্কেপিক জীবের ডিএনএ। এতে করে তারা উপাঙ্গের মতো পা তৈরী করতে পেরেছে। এভাবে এরা এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে রূপান্তরিত হয়েছে একাধারে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও কীটে।"

সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কথাগুলো শুনছে। কেউ কোনো প্রশ্ন করছে না দেখে মারুফ নিজের কথা বলতে থাকলো, "এবার আসি এদের আলোর ব্যাপারে। তার আগে বলি এই জীবটি আমাদের চেয়েও বুদ্ধিমান। এরা জানে এদের খাবারের উৎস সুবিধাজনক না। তাই তারা পরে এসে নিজেদের মধ্যে প্লাস্টিড তৈরী করতে শুরু করেছে। কিন্তু কথা হলো এই প্লাস্টিড ঠিক ক্লোরোপ্লাস্টের মতো কাজ করে না। আপনারা জানেন ক্লোরোপ্লাস্টে দুই ধরনের ক্লোরোফিল থাকে, ক্লোরোফিল-a আর ক্লোরোফিল-b। তবে এরা একটি ভিন্নধর্মী ক্লোরোফিল ধারন করে যাদের মধ্যে ফ্লোরেসেন্ট ফসফরাসের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এর ফলে এরা খুব সহজেই সবুজ আলো তৈরী করতে পারে। আবার এই ক্লোরোফিলের জন্য তারা অতি সামান্য আলোতেও সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে। তার মানে এদের খাদ্যের জন্য চিন্তা করার আর কোনো প্রয়োজন থাকলো না।"

ড. মহসীন প্রশ্ন করলেন, "তাহলে এখানে নিউরোটক্সিন তৈরীর কারন কি?"

মারুফ মুচকি হেসে উত্তর দিলো, "এই জায়গায় এসে আমি বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম। তবে উত্তর আমি পেয়েছি। এরা কলোনি আকারে থাকে না। কিন্তু দল বেঁধে আমাদের মতো একত্রে থাকে। অনেকটা সমাজ গঠনের মতো। এদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য সিগন্যালিং মেকানিজম প্রয়োজন। তাছাড়া এমন কিছু প্রয়োজন যা এদের আকর্ষিগুলোকে চলাচল করাতে পারে। আকর্ষিগুলো নাড়াতে সোডিয়াম-পটাশিয়াম ট্রান্সফার পাম্পের বদলে সোডিয়াম-ফসফরাস ট্রান্সফার পাম্প ব্যবহৃত হয়। এতে দেহে সোডিয়ামের মাত্রাও ঠিক থাকে, ফসফরাস গ্রহণ করাও সহজ হয়, আবার আকর্ষিগুলোও চলাচল করতে পারে। আর কোনো বাইরের বস্তুকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করাও সহজ হয়।"

"তখনই এদের একটি জিন প্রচন্ড গতিতে একটি অ্যালকালয়েড তৈরী করতে থাকে। এই অ্যালকালয়েড কোকোইনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। গঠনও অনেকটা কোকেইনের মতোই। তাই সেদিন ডাক্তার একে কোকেইন ভেবে ভুল করেছিলেন।"

এতক্ষণ ড. জসীম চুপচাপ শুনছিলেন। এবার তিনি বলে উঠলেন, "মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিতে কোকেইনের ব্যবহার অনেক। কিন্তু মাদক হিসেবে এটি ভয়াবহ। এই জীবটি দিয়ে কি আমরা চাইলে কোকেইন তৈরী করতে পারি?"

মারুফ চিন্তিত কণ্ঠে জবাব দিলো, "স্যার, এজন্যই আমি আসলে আগে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলাম। আসলে আমরা চাইলে হয়তো জেনেটিক্যালি মডিফাই করে ভবিষ্যতে একে কাজে লাগাতে পারবো মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিতে। কিন্তু তার আগেই এটি এখনই একটি জলজ্যান্ত মাদকদ্রব্য হয়ে আছে! এমনকি এই তথ্য যদি এই রুমের বাইরেও বের হয়, তাহলেই আগামী দশ দিনের মধ্যে বঙ্গোপসাগর মাদক কারবারি দিয়ে ভরে যাবে। এর পেছনে অনেক দেশি বিদেশি গডফাদাররা উঠেপড়ে লাগবে। আমাদের দেশটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না। কারন আমি নিজেই চাইলে মাত্র ২০০টি মাইক্রোস্কোপিক জীব দিয়ে একজনের জন্য পাঁচদিনের মাদক তৈরী করে ফেলতে পারবো। তাহলে বুঝুন এদের এই নিউরোটক্সিন তৈরীর ক্ষমতা কতো বেশি।"

ড. জসীম: তাহলে আপনি কি চান?

মারুফ: আমাদের এই জায়গাটি পরিত্যাক্ত ঘোষণা করে লোকচক্ষুর আড়ালে সংরক্ষণ করা উচিত। সাধারণ মানুষ যেন এই রিসার্চের কোনো তথ্য হাতে না পায় সেই ব্যবস্থা করা উচিত। নাহয় ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ধ্বংসের জন্য দায়ী থাকবে বৃশ্চিক!

(এই গল্পের সকল চরিত্র ও বৃশ্চিক নিজেই কল্পনাপ্রসূত। বাস্তবে এদের অস্তিত্ব নেই। তবে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সত্য, পাঠক তা চাইলে নিজেই খুঁজে সত্য-মিথ্যা বের করে নিতে পারেন।)

!!!! সমাপ্ত !!!!

হাসিবুল ইসলাম

ব্যাচ:৭৭

কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীর স্তব্ধতা ১ সেকেন্ড

এক সেকেন্ড !!!

এক সেকেন্ড সময়টাকে আপাতদৃষ্টিতে অনেক কম সময় মনে হয় আমাদের কাছে। এক সেকেন্ডে কি এমন হতে পারে তাই না! চিন্তা করলে মাথায় কিছুই আসে না, কত কত সময় নষ্ট করি আমরা, কথার ছলে বলি ১ সেকেন্ড দাড়ান, ১ সেকেন্ড অপেক্ষা করুন ব্লা ব্লা ব্লা কত কিছু।

কিন্তু আসলে কি সেই ১ সেকেন্ড সময়টুকু এক সেকেন্ডই হয়? না আরো অনেক বেশি হয়!!!

আমরা যদি গভীর ভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে ১ সেকেন্ডে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। একটা বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার ১ সেকেন্ডের মধ্যে একজনের মৃত্যু হতে পারে, ১ সেকেন্ডের জন্য গতিশীল বস্তুর সাথে ধাক্কা খেলে আমাদের দেহ, জিনিসপত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

পৃথিবীর বড় বড় ভয়াবহ ঘটনাগুলো কিন্তু ১ সেকেন্ডেই ঘটে । বৃহৎ কিছুর সাপেক্ষে ক্ষুদ্র সময় চিন্তা করলে এই ১ সেকেন্ড অনেক কিছু।

অনেক খাজুইরা আলাপ হলো, আসেন এবার আসল কথায়। শুরুতে গল্পের যে শিরোনাম দিয়েছিলাম তা স্বাভাবিকভাবে কোনো চিন্তা না করে পড়লে আহামরি কিছু মনে হবে না। কারণ ঐ যে বললাম আমাদের ধারণা, ১ সেকেন্ডে কি বা এমন হয়, লোক মুখে শোনা যায় কোটিপতিরা নাকি তাদের পড়ে যাওয়া টাকা তোলার জন্য ১ সেকেন্ড ও ব্যয় করেন না । কারণ ঐ সময়ে সে ঐ টাকার চেয়ে কয়েকগুন বেশি টাকা আয় করতে পারবেন।

এখন কথা হলো এতো কথা বাড়ানোর কি আছে?? আসলে আপনাদেরকে পার্থিব কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলাম, যাতে আমার পরের কথা গুলো আপনাদের কাছে পাগলের কথা বা তরল পানীয় পান করার পর কথা না মনে হয়।

আচ্ছা আপনারা একবার গভীর ভাবে চিন্তা করেন তো, যদি সত্যিই পৃথিবী তার আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি ১ সেকেন্ডের জন্য থামিয়ে দেয়, তাহলে কি কি হতে পারে!

এটা চিন্তা করার আগে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে পৃথিবী সত্যি ঘুরছে। কিন্তু আমরা ঘুরাছিনা কেন এটা যদি বলেন তাহলে আমি বলবো, পৃথিবী থেকে আমরা অনেক ছোটো তাই আমরা সাথে সাথে ঘুরছি না। একটা পিঁপড়াকে বড় পাতিলে রেখে পাতিলটা ঘুরালে ঐ পিঁপড়ার যেমন কিছুই মনে হবে না, আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমন।

আপনাদের যদি উপরে বলা চিন্তাটা করা হয়ে থাকে তাহলে আসেন এখন মিলিয়ে দেখি। আপনারা কি চিন্তা করেছেন আর আমি কি লিখেছি।

আপনারা মনে করতে পারেন কি পৃথিবীর গতিবেগ কত? বা পৃথিবী কত বেগে ঘুরছে?

পৃথিবীর কক্ষপথের গতি প্রায় ৩০ কিমি./সে. (১০৯,০৪৪ কিমি./ঘ.; ৬৭,৭৫৬ মাইল/ঘণ্টা), অর্থাৎ পৃথিবী ৭ মিনিটের মধ্যে এর নিজ ব্যাসের সমান দূরত্ব এবং ৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

এই গতিটা কত বেশি চিন্তা করতে পারছেন? চিন্তা করার পর উপলব্ধি করানোর জন্য আরেকটা উদাহরণ দেই।

আমরা সাধারণত যে বাস গুলোতে চড়ি সে গুলো গতিবেগ ঘন্টায় ৬০/৭০/৮০/৯০ কিমি. বিশেষ ক্ষেত্রে ১০০-১২০ কিমি. হয়ে থাকে। সেকেন্ডে হিসাব করলে তা ০.০১ কিমি. এর কাছাকাছি বা এর থেকে একটু বেশি মান আসে।

এখন ভেবে দেখেন এই (একটু বড় পরিসরে) যে ঘন্টায়

৬০/৭০/৮০/৯০ কিমি. বেগে চলা গাড়ি গুলো যখন ১ সেকেন্ডের জন্য হঠাৎ করে ব্রেক করে তখন আপনাদের অবস্থা কি হয়? বসে থাকতে পারেন আগের মত সিটবেল্ট ছাড়া?

কখনই পারেন না। পৃথিবীর গতির কাছে এই গতি কিছুই না। এতো আস্তে চলা বাহনটি ব্রেক করার পর যদি ঐ হেলে পড়া, পড়ে যাওয়া, নাক মুখ ফাটার অবস্থা হয়, তাহলে সেকেন্ডে ৩০ কিমি. আই রিপিট সেকেন্ডে ৩০ কিমি., ঘন্টায় না, বেগে চলমান পৃথিবী থেমে গেলে আপনাকে আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে? যদি বেঁচে থাকি দেখা যাবে বাংলাদেশ থেকে চিলিতে চলে গেছি। যদিও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই।

ধরেন আমরা বেঁচে আছি, পৃথিবী ১ সেকেন্ড ব্রেক করার পর। কিন্তু আমি তো বলি নি পৃথিবী ১ সেকেন্ড ব্রেক করেই থেমে থাকবে। সে তো আবার চলা শুরু করবে তাই?এখন চিন্তা করেন হঠাৎ ব্রেক করা বাসটি আবার চলা শুরু করলে আপনার অবস্থা কেমন হয়। যেমন চিন্তা করছেন তার চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা হবে যখন পৃথিবী আবার চলা শুরু করবে।

এবারও যদি আপনি বেঁচে থাকেন তাহলে হয় তো নিজেকে আবিষ্কার করবেন মহাশূন্যে, কারণ আমরা তো পৃথিবীর পৃষ্ঠে বসবাস করছি, গাড়ি হঠাৎ চলা শুরু করলে যেমন পিছনে হেলে যাই, তেমনি পৃথিবী চলা শুরু করলে আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে উঠে যাব, কারণ গতিটি কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, ঘন্টায় ১০৯,০৪৪ কিমি.।

তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে যদি পৃথিবী ১ সেকেন্ডের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় তাহলে আমরা কেউই আর তার জায়গায় থাকবো না।

এখন কথা, শুধু কি আমাদের জায়গাই পরিবর্তন হবে! আর কিছুই হবে না?

হবে হবে, আরো অনেক কিছু হবে।

পৃথিবীর বায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং এক সেকেন্ড পরে এতো জোরে প্রবাহ শুরু হবে যে কোনো কিছুই আর টিকে থাকতে পারবে না। ঝড়ের বাতাসের গতি ঘন্টায় ১০০-১৫০ কিমি. হয়, তাতে যা হয় এ থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছেন নিশ্চয়ই।

এই বায়ু প্রবাহের সাথে কিন্তু সমুদ্রের পানির একটা ভালোবাসার সম্পর্ক আছে। হা! হা! হা! স্তব্ধতার পর বায়ু কিন্তু একা প্রবাহ হবেনা। থামার কারণে সমুদ্রের পানিতে যে জড়তার তৈরির হয়েছিলো তাতে আগুনে ঘি ঢালার মত ভুমিকা পালন করবে বাতাস, সমুদ্রে দেখা দিবে Burj Khalifa এর থেকেও উঁচু উঁচু ঢেউ। আরো সহজ হলো না ভয়াবহকতা!

আর একটু ভয়াবহতার দিকে যাওয়া যাক।

ছোটো বেলায় আমরা যারা মোমবাতির আলোতে পড়ালেখা করেছি তারা নিশ্চয়ই খেলার ছলে বা মজার ছলে হলেও মোমবাতির সেই আগুনের মধ্য দিয়ে নিজেদের তর্জনী আগুলটি একবার হলেও চালিয়েছি।

প্রথমবার যখন চালিয়েছিলেন তখন অনেক ভয় লেগেছিলো তাই না, অনেক দ্রুত চালিয়েছেন?

যাই হোক মোমবাতির আগুনের তাপ অনেকটাই কম কারণ এটা ছোট্ট একটা বস্তু, সহ্য করা যায় এমন।

কিন্তু আপনি যদি ঐ মোমবাতির জায়গায় সূর্যকে চিন্তা করেন আর আপনার হাতটা ১ সেকেন্ডের জন্য এর উপর স্থির রাখেন তাহলে কি হবে একবার ভাবুন তো।

সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত যে তাপ আসছে তার তাপমাত্রাটা মূলত বাতাস এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে কম কম অনুভূতি হচ্ছে। যদি একটা বস্তুকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাপ দেন আর না ঘুরিয়ে স্থির রেখে তাপ দেন তার তাপমাত্রার পরিমাণ কি একই হবে?

ঠিক একইভাবে,পৃথিবী যদি হঠাৎ ১ সেকেন্ডের জন্য থেমে যায়, তাহলে সূর্য দিকে যে অংশটি থাকবে তা একবারে গলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এবং ঠিক তার বিপরীতে যেখানে আলো পড়ে নি যেখানে ঠান্ডা হয়ে বরফ জমে যাবে। ২ পাশেই কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না।

এছাড়াও পৃথিবীর আশেপাশে তো অনেক কিছু ঘোরাঘুরি করছে, পাথর, ধুমকেতু, উল্কা, তাঁরা এগুলো এতো এতো জোরে উড়ে এসে পৃথিবীতে ধাক্কা খাবে যে তা বলার মত না। এতো ভয়ঙ্কর সব চিন্তা আমাদের চিন্তাতেই থাক, এটা যেনো বাস্তবতায় রূপ না নেই, চাই পৃথিবী সারাজীবনই নিজের আপন গতিতে ঘুরতেই থাকুক, কোনো দিন যেনো থেমে না যায়।

ভালো থাকুক পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু।

আবদুল্লাহ আল মামুন
ব্যাচঃ ৭৮
কৃষি অর্থনীতি অনুষদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

অদৃশ্য লাইন

পৃথিবী নিজেই এক রহস্যের আধার। এই রহস্যের কিছু সময়ের ব্যবধানে মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। অধিকাংশই এখনো মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। কৌতুহলী মানুষ বারংবার চেষ্টা করেছে পৃথিবীর রহস্যভান্ডার উন্মোচন করার। এমনই এক কৌতুহলী মানুষ জন্ম নেয় ১৮২৩ সালের ৮ জানুয়ারি। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শীর্ষ বিবর্তন বিষয়ক চিন্তাবিদের একজন । প্রকৃতিপ্রেম তাকে প্রকৃতি নিয়ে ভাবাতে শুরু করে। তাই সেই সময়ের পরিবেশ দূষণ নিয়ে কথা বলা বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম দিকে ছিলেন যুক্তরাজ্যে জন্ম নেওয়া এই বিজ্ঞানী আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস।

জুওলজিস্ট জার্নালে গুবরে পোকা নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করা বেইটসের উৎসাহেই ওয়ালেস পোকামাকড় সংগ্রহ শুরু করেন।নিথ নদীর উপত্যকায় একটি রেললাইন নির্মাণের জরিপকাজে পুরঃপ্রকৌশলী হিসেবে চাকরি পেলে ওয়ালেসকে প্রচুর সময় গ্রামের বনাঞ্চলে কাটাতে হতো যা তার পোকা সংগ্রহের নেশাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।

কোনো কিছুর প্রতি নেশা মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। তিনি শুরু করলেন কাজের পাশাপাশি প্রকৃতি দর্শন। প্রকৃতির প্রতিটি জীবিত উপাদানকে পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণে যেয়ে তিনি কিছু অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করেন। তিনি লক্ষ্য করে দেখেন,বালি ও লম্বক দ্বীপের দূরত্ব খুবই কম (প্রায় ২২ মাইল) পাশাপাশি দুইটি দ্বীপ; কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাণিকূলের অনেক পার্থক্য। এক দ্বীপের পাখিরা পর্যন্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে চলাফেরা করলেও আরেক দ্বীপে যায় না। কয়েক প্রজাতির বাদুড়, ইদুর জাতীয় প্রাণি কিছু বানর ছাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায় না।বালি দ্বীপে বাঘ,রাইনো,হাতি এসব প্রজাতির প্রাণীর দেখা মিলে। লম্বকে টিকটিকি, গিরগিটি,ক্যাঙ্গারু জাতীয় প্রাণির খোঁজ পাওয়া যায়। এই সীমারেখা প্রাণীর জন্য স্থায়ী হলেও, উদ্ভিদ এর ক্ষেত্রে তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তবে অস্ট্রেলিয়ান কিছু ইউক্যালিপটাস এ লাইন অতিক্রম করে না। এসব দেখে তিনি ইন্দোনেশিয়ার মাঝ বরাবর এক কাল্পনিক রাখা রয়েছে বলে মনে করেন যা আসলে বায়োজিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি । এই লাইনটি দুটো দ্বীপের প্রাণিজগৎ কে পৃথক করে রেখেছে। দুটো ভিন্ন প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান দিকে মার্সুপিয়ান এর বিভিন্ন প্রজাতির দেখা মিলে। এশিয়ান দিকে এসব প্রাণির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না।প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ীর মধ্যে বানর,হাতি,গন্ডার,বিড়াল দেখা যায়।

ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপ বালি ও লম্বক স্ট্রেইট এর মধ্যে গভীর জল একটি বাধা সৃষ্টি করে বিধায় জলজ প্রাণিরা এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে তিনি ধারণা করেন।তাছাড়া দ্বীপের পাখিগুলো পরিযায়ী পাখি না হওয়ায় তাদের জন্য দুই দ্বীপের মধ্যবর্তী ৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয় বলে এই প্রাণিবৈচিত্র্য তখন বিদ্যমান ছিল।এভাবেই পৃথিবীর সামনে চলে আসা এই রহস্যের ব্যাখ্যা দাঁড় করান তিনি; যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে আরও অনেক কিছু মানবজাতির কাছে উন্মোচিত হয়

পি.এম.আফরোজা আফিফা
ব্যাচঃ ৭৯
কৃষি অনুষদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

মাংসাখেকো মৌমাছি

২০ মে সারাবিশ্বে মৌমাছি দিবস পালন করা হয়। এত কিছু থাকতে মৌমাছি দিবসই কেন? যারা কমবেশি বিজ্ঞান জানেন, তাদের নতুন করে আর এটা বোঝানোর দরকার নাই যে মৌমাছি না থাকলে দুর্ভিক্ষে মারা যেতে আমাদের বেশিদিন লাগবে না । পরাগায়নে সাহায্য করা ছাড়াও মৌমাছি মধুও উৎপাদন করে। এদের মধু সংগ্রহের জন্য আপনি আপনার বাগানের চারপাশে প্রায়ই এদের দেখা পান নিশ্চয়ই। ফুলের বুকে ঘুরে বেড়ানো মৌমাছিকে আমরা বেশ আবেগের সাথেই গ্রহণ করি। কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের মৌমাছি আছে যারা ফুলের মধুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে! ভয়ের ব্যপার হলো, তারা এখন মাংস খায়!

ভালচার মৌমাছি (*Trigonopsis necrophaga*) বা Vulture Bees বা Carrion Bees, Apida পরিবারের একটি সদস্য। এরা দেখতে কালচে বাদামী বর্ণের। এদের মুখের গহ্বরে মধু চোষক (sucking probosis) পরিবর্তিত হয়ে অতিরিক্ত এক জোড়া শক্ত দাঁত তৈরী করেছে। ফলে এদের আর ফুলের মধুর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় না। বরং এরা এখন শক্ত দাঁত দিয়ে মাংস চিবিয়ে খেতে পারে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া এই মৌমাছিগুলো অনেকটা শকুনের মতোই আচরণ করে। এরা মৃত জীবজন্তু থেকে মাংস কামড়ে খায়, আর বাস করে মাটির নিচে গর্তে কিংবা গাছের গুড়ির গর্তে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এরা মধু না খেলেও মধু উৎপাদন করতে পারে! এরা মাংসের নির্যাস থেকে বিশেষ মধু গ্রন্থির মাধ্যমে মধু তৈরী করে আর মৌচাকে জমা রাখে। এদের মৌচাকেও আমাদের সাধারণ মৌমাছির মতো তিন ধরনের মৌমাছি থাকে। যথারীতি রানি মৌমাছি শুধু ডিম পাড়ে আর চাকের অন্যান্য মৌমাছিকে নিয়ন্ত্রণ করে, পুরুষ মৌমাছি শুধু ডিম নিষিক্ত করে আর কর্মী মৌমাছি খাদ্য সংগ্রহে ঘুরে বেড়ায়। যেহেতু এদের খাদ্যাভ্যাসে মাংস আছে, তাই এদের মধুতেও বিশেষ কিছু প্রোটিন পাওয়া যায়। আগেই জানিয়েছি, এরা মৃত জীব থেকে মাংস খায়। সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও আছে। এরা মৃত জীবজন্তুর দেহ পচনে এবং অপসারনে সাহায্য করে পরিবেশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

এতক্ষণ তো আমরা ভালচার মৌমাছি নিয়ে কিছু কথা জানলাম। সম্ভবত সবাই বুঝতে পারছেন এই মৌমাছিগুলো তেমন ভয়ানক কিছু না। তবে এখনই আশায় বুক বাঁধার প্রয়োজন নাই। ভেসপা মৌমাছি বা ভেসপা বোলতা (*Vespa mandarinia*) একধরনের মৌমাছি যারা জীবিত প্রাণিই শিকার করে খায়! দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পাওয়া এই মৌমাছিদের দেখতে কিন্তু বেশ ভয়ানক। লোমহীন এদের চকচকে দেহের রং হলুদ, তার ওপর কালো ডোরা কাটা। কিছু প্রজাতির দেহ আবার চকচকে কালো রঙের। এরাও সাধারনত পাথরের ফাঁকে কিংবা মাটির নিচে চাক বানায়। এদের প্রধান খাদ্য অন্যান্য ছোট ছোট কীটপতঙ্গ। এরা মধু প্রস্তুতের জন্য বিশেষ গ্রন্থি ব্যবহার করে। এই মধুও আবার প্রোটিন সমৃদ্ধ। ভেসপা মৌমাছির আক্রমণের শিকার কিন্তু আমাদের নিরীহ মৌমাছিরাও হয়। ফলে ধরেই নিতে পারেন এরা বেশ মারকুটে ও পরিবেশের জন্য ভালোই ক্ষতিকর।

এখন কথা হচ্ছে, মানুষের জন্য ভেসপা মৌমাছির ক্ষতির মাত্রা কতটুকু। এই মৌমাছিগুলো সরাসরি মানুষকে আক্রমণ করে না। সাধারণত এরা থাকে লোকালয় থেকে দূরে, ফলে মানুষকে আক্রমণের মতো ঘটনা সচারাচর দেখা যায় না। তবে এদের হুলের বিষ প্রচণ্ড তীব্র।

এই বিষে ম্যাস্টোপ্যারন (Mastoparan) নামক যৌগ থাকে যা মাংসপেশি পুড়িয়ে ফেলার মতো অসহ্য ব্যাথার উদ্রেক ঘটাতে পারে। তাছাড়া এদের হুলের বিষে ম্যানডারাটক্সিন (Mandaratoxin)নামক একধরনের নিউরোটক্সিন থাকে। যদিও একটা দুটো মৌমাছির হুলে একজন মানুষের প্রাণনাশের আশংকা নাই। তবে আপনি যদি একঝাঁক ভেসপা মৌমাছির খপ্পরে পড়েন তবে নিশ্চিত থাকুন জমদূত আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এদের খুড়তুতো ভাই *Vespa luctuosa* হলো আরো ভয়ানক। তাদের বিষ এতটাই ভয়ানক যে তাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত বোলতার খেতাব দেয়া হয়েছে।

যাহোক, ফুল, মধু, মধুকরী, সবাই আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। আমরা যেমন ফুল ভালোবাসি, তেমনি ভালোবাসি ফুলের ওপর মৌমাছির নেচে বেড়ানো। মৌমাছির পরাগায়ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ তাদের তৈরী আশ্চর্যজনক খাদ্য- মধু। বিষাক্ত মাংসাশী মৌমাছিগুলো আমাদেরই পরিবেশ দূষনের ফলে অভিযোজিত হয়েছে। পরিবেশে টিকে থাকতে ফুলের অভাবে তারা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করেছে। এখনঅবধি তারা কীটপতঙ্গ বা মৃত জীবের দিকের তাকিয়ে আছে। কিন্তু কল্পনা করুন, কোনো এক অভিযোজনের ফলে যদি মাংসখেকো মৌমাছিগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে দল বেঁধে পঙ্গপালের মতো আমাদের লোকালয়ে আসে এবং আমাদের ওপর আক্রমণ করতে থাকে, তখন কি হবে! ভাবতেই গা শিউরে ওঠে, তাই না?

সপ্তর্ষি রায়
ব্যাচ: ৭৯
কৃষি অনুষদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

হাসিবুল ইসলাম
(সহকারী লেখক)
ব্যাচ:৭৭
কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিডিবিও এবং আমি

আমি বর্তমানে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ে ৩য় বর্ষে অধ্যয়নরত আছি, অথচ এডমিশন পর্বের শুরুতেও আমি কল্পনা করি নি যে আমি এখানে আসব। কেননা যেখানে কলেজ জীবন থেকেই বায়োলজির সাথে বরাবরই আমার ঘোরতর বিরোধ ছিল, সেখানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বায়োলজির সাথে এভাবে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে যাব তা ভাবা আমার জন্য কল্পনাতীত।

১ম বর্ষেই(২০২২) আমার বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পিয়াড(উত্তর অঞ্চল) এর সাথে যুক্ত হওয়া। কোনো কিছু বুঝে উঠবার আগেই এই সংগঠন কেমন যেন আমার খুবই আপন হয়ে গেল। প্রত্যেক অলিম্পিয়াডের আগে আগে ক্যাম্পেইনিং থেকে শুরু করে সকল এনজাইমদের একত্রিত হওয়া, মিটিং এটেন্ড করা, টিমওয়াইজ কাজ ভাগ করে নেয়া, বিগত অলিম্পিয়াডের ভুলগুলো পরিমার্জিত করার পরিকল্পনা করা, ডেকোরেশনের কাজ করা ইত্যাদি মিলে মোটামুটি একটা উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, এই সংগঠনের প্রত্যেকেই বিশেষ করে সিনিয়র ভাই এবং আপুরা যারা ছিলেন, যারা আছেন তারা বরাবরই আমাকে কিছু না কিছু শিখিয়ে গেছেন, যার দরুণ তাদের প্রতি আমি আজীবনই কৃতজ্ঞ থাকব। তারা তাদের মেধা ও মনন দিয়ে যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেভাবে সামলে নেন, তা আমাকে প্রতিবারই মুগ্ধ করে।

এবার আসি যে কারণে এসব কথা আমি লিখছি সে কারণ উদঘাটনে! এই ২ বছরে এমন কিছু মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে যারা একদম নিরলসভাবে এ সংগঠনের পেছনে কাজ করে গেছেন, এ সংগঠনে না আসলে হয়ত তাদের সান্নিধ্য আমি কখনোই পেতাম না। তাদের দেয়া উৎসাহ এবং উদ্দীপনাই যেন পুরো প্রোগ্রামজুড়ে বিচরণ করতে থাকে, যার কারণে পুরো প্রোগ্রামজুড়ে আমার কখনো ক্লান্তি আসে না, কোনো দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যায় না। আমি জানি না এ সংগঠন বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলকে আমি কি দিতে পেরেছি, তবে আমাকে যথেষ্ট ধৈর্য্যশীল এবং একনিষ্ঠ ব্যক্তিতে রূপান্তর করায় এ সংগঠনের কাছে আমি আমৃত্যু ঋণী থাকব!

জান্নাত আরা রুবি
ব্যাচ: ৮০
কৃষি অনুষদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পিয়াডের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা

প্রথমে বলতে হয় কিভাবে এই বায়োলজি অলিম্পিয়াডে যোগ দিলাম?

বায়োলজি অলিম্পিয়াডে যোগ দেয়ার প্রধান কারণ বায়োলজি সাব্জেক্ট ভালো লাগে সেখান থেকে। স্কুলে পড়ার সময় সবচেয়ে বাজে সাব্জেক্ট ছিল বায়োলজি কিন্তু ধীরে কেমন যেন ভালো লাগতে শুরু করল। সেই থেকে বায়োলজি প্রিয় সাব্জেক্ট হয়ে গেল।

অলিম্পিয়াডে যোগ তো দিলাম। এবার আসি কাজের বিষয় নিয়ে। বায়োলজি অলিম্পিয়াডে যোগ দিয়েই দেখলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমেই ক্যাম্পেইন এর অভিজ্ঞতা বলি, এটা ছিল জীবনের প্রথম কোনো ক্যাম্পেইনে যাওয়া। ক্যাম্পেইনে যাওয়ার দিনে সকালে সবাই একসাথে হলাম। সিনিয়র ভাইয়া আপুরা ঠিক সময়ে এসেছিল,পরে যার যার নির্দিষ্ট এলাকা অনুযায়ী গ্রুপ করে বেরিয়ে পড়লাম। কয়েকটা স্কুলে গিয়েছিলাম ক্যাম্পেইনের জন্যে।

কখন যে সময় শেষ হয়ে গেছে বুঝতেই পারি নি। বিশেষ করে সিনিয়র ভাই-আপুদের সাথে প্রথমবার কোথাও যাওয়া।সবচেয়ে ভালো লেগেছে ক্লাসে গিয়ে গিয়ে স্টুডেন্টদেরকে জানানোর বিষয়টা। অনেকেই বায়োলজি অলিম্পিয়াড সম্পর্কে জানতোই না,তাদের মাঝে খবরটা পৌছে দিয়ে ভালোই লেগেছে।স্যার, ম্যামরা অনেক আন্তরিক ছিলেন। এই ছিল প্রথম দিনের ক্যাম্পেইন।

এরপর এক্সামের কারনে আর ক্যাম্পেইনে যাওয়া হয় নি।

আঞ্চলিক বায়োলজি অলিম্পিয়াড :

আমাদের প্রথমে বিভিন্ন টিমে ভাগ করে দিয়েছিল। এর পর প্রতি টিমের ভাইয়া আপুরা আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছিল আমাদের কি করতে হবে,কি করতে হবে না। এভাবে করতে করতে প্রোগ্রামের দিন চলেই এল। আমি আঞ্চলিক পর্যায়ে এক্সাম টিমে ছিলাম। সকালে উপস্থিত হয়ে খাবার, টি-শার্ট নিয়ে যে যার এক্সাম হলে চলে গেলাম। গিয়ে রুম ভালো ভাবে চেক করলাম সব ঠিক আছে কি না। স্টুডেন্টরা আসা শুরু করল। এক্সাম টাইমে আমরা এক্সাম শুরু করে দিলাম। এক্সাম ভালো ভাবেই সম্পন্ন হলো। এরপর স্টুডেন্টদের নিয়ে টিএসসি গেলাম। সেখানে প্রোগাম হলো,বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হলো, সবাই অনেক খুশি। এভাবেই আমাদের আঞ্চলিক প্রোগ্রাম শেষ হয়।

এরপর আসি জাতীয় জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে:

জাতীয় জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে আমি ডিসিপ্লিন টিমে সাথে যোগ দেই। আবার আমাদের টিম ভাগ করা হল,ভাইয়া আপুরা বার বার আমাদের দিক নির্দেশনা দিলেন কি করব,কি না করব।

জাতীয় জীব বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা হলো আমি একটা জায়গায় দাঁড়ায় থেকে স্টুডেন্ট গার্ডিয়ান দের নির্দেশনা দিচ্ছিলাম কোথায় যেতে হবে,কি করতে হবে।

আমার আশেপাশে কিছু গার্ডিয়ান ছিল তারা অনেকক্ষণ এসব দেখে বলল, তখন থেকে দেখছি তুমি এখানে দাঁড়ায় আছো, স্টুডেন্টদের কথা বলতেছ, কেন? আমি বললাম,

"আন্টি আমরা বায়োলজি অলিম্পিয়াড এর এনজাইম, আমাদের কাজ আপনার সন্তান যেন ভালোভাবে সব কিছু করতে পারে সেগুলো দেখে রাখা"।

এটা শুনার পর আরোও কিছু গার্ডিয়ান অবাক হলো আর বলল," বাহ এতো কষ্ট তোমরা আমাদের সন্তানদের জন্যে করছ"।

ওদের চোখে একটা মায়া দেখতে পেলাম সেটা আমার অনেক ভালো লেগেছে। এক আন্টি তার পানির বোতল টাও আমাকে দিয়ে দিয়েছিল খাওয়ার জন্যে।

সত্যিই এটা অনেক বড় পাওয়া ছিল, সারাজীবন মনে থাকবে।

আমাদের প্রোগ্রাম অনেক ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়।

বায়োলজি অলিম্পিয়াডের একজন এনজাইম হয়ে আমার সত্যিই অনেক ভালো লাগে।

জাকিয়া সুলতানা জেসমিন

৮১ ব্যাচ

কৃষি অনুষদ

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

"সুপারফুড স্পিরুলিনা"

স্পিরুলিনা

অনেকের কাছেই নামটি বেশ অজানা। গবেষণায় স্পিরুলিনা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জীব হওয়ার প্রমাণ মিলেছে।পুষ্টিগুণ বিবেচনায় এটি যেনো সর্বেসর্বা; একের ভিতর সব। তাই বর্তমান সময়ে এটিকে 'সুপার ফুড' হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য পৃথিবীর সবথেকে প্রাচীন এই জীবে রয়েছে সবচেয়ে বেশি পুষ্টি! ১ টেবিল চামচ স্পিরুলিনাতে রয়েছে ৪ গ্রাম প্রোটিন,১ গ্রাম ফ্যাট, ২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট। অন্যভাবে বললে ১০০ গ্রাম স্পিরুলিনাতে রয়েছে ৩৭৪ কিলোক্যালোরি শক্তি যার ৬০-৭০ শতাংশই প্রোটিন। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রতি ১০০ গ্রাম স্পিরুলিনাতে রয়েছে ৫৮২ গ্রাম কলিজার সমপরিমাণ লৌহ, ৩ টি কলার সমপরিমাণ পটাশিয়াম, ৩৭৭ গ্রাম শাকে বিদ্যমান পরিমাণ জিংক এবং ১১০ মিলি লিটার দুধের সমপরিমাণ ক্যালসিয়াম যা শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই খেতে পারবেন। এতে আরও রয়েছে থিয়ামিন, রিবোফ্লাবিন, নিয়াসিন এর মত ভিটামিন সমূহ। দুঃখজনক হলেও সত্য পুষ্টিকর এই শৈবাল খেতে স্বাদহীন অথবা কিছুটা তেতো স্বাদের।

এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়; টিউমার এর বৃদ্ধি ব্যাহত করে। ফাইকোসায়ানিন বিশিষ্ট এই স্পিরুলিনা কোলেস্টেরলের লেভেল কমায় যা হার্ট এ্যাটাক,ব্রেইন স্ট্রোক সহ নানা মরণব্যাধি রোগ হতে পরিত্রানের উপায়। শুধু তাই নয় উচ্চ রক্তচাপ অ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা রয়েছে।

অবাক করার মতো বিষয় যে স্পিরুলিনা ব্যবহৃত হয় রূপচর্চায়ও। স্পিরুলিনা পাউডার স্ক্রাব , ফেসপ্যাক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি দেহে জমে থাকা মেটাল টক্সিসিটি অপসারণে সাহায্য করে দাঁত,মাড়ি,ত্বক ও চুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখে।

প্রশ্ন জাগতে পারে যে এই শৈবাল কি প্রতিদিন খাওয়া যায়? এর উত্তর হলো হ্যা! বাজারে Acme গ্রুপের স্পিরুলিনা ট্যাবলেট খুবই সহজলভ্য যেখানে ট্যাবলেট প্রতি ৪৫০ মিলিগ্রাম স্পিরুলিনা এর মূল্য মাত্র ৪ টাকা।এছাড়াও রয়েছে Incepta গ্রুপের Protinavit যেখানে ক্যাপসুলপ্রতি ৫০০ মিলিগ্রাম স্পিরুলিনা রয়েছে।

এই তো গেলো দৈনন্দিন জীবনে স্পিরুলিনার ব্যবহার। এখন এই শৈবলটির সম্পর্কেই কিছুটা জানা যাক।

স্পিরুলিনা হলো এক ধরনের মাল্টিসেলুলার, ফিলামেন্টাস সায়ানোব্যাক্টেরিয়া যাকে 'Blue Green Algae' ও বলা হয়ে থাকে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Arthrospira platensis* . কেউ একে 'Dried Biomass ' বলেন। এটি বিশ্বব্যাপী স্বাদু ও লবনাক্ত পানিতে পাওয়া যায়।

আশির দশকে বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের তত্ত্বাবধানে স্পিরুলিনা চাষ শুরু হয়।কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তখন বাংলাদেশ স্পিরুলিনা চাষে সফল হতে পারে নি। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এএফএম জামাল উদ্দিন বলেন সেসময় এই শৈবাল তৈরির জন্য উন্মুক্ত স্থান যেমন সুইমিং পুল বা এই ধরণের কংক্রিটের খোলা স্থান নির্বাচন করা হয় যেখানে পাতা, মশা, মাছি, মরা ইঁদুর, ধুলা এমনি সাপ পর্যন্ত পাওয়া যায় যা শৈবালের গুণাগুণ নষ্ট করে।এছাড়া মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতেও ব্যর্থ হয় কর্তৃপক্ষ।

দিনাজপুরের কৃষি বিভাগের উপপরিচালক মাহাবুবুর রশীদ জানান মাশরুমের তুলনায় স্পিরুলিনা চাষ বেশ কঠিন প্রক্রিয়া। তাছাড়া এটি চাষের প্রতিটি ধাপে কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ল্যাব, প্যাকেজিং, বাজারজাত, প্রডাকশন হাউসের হাইজিনের সার্টিফিকেট নিতে হয়।ব্যাপারটা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা কঠিন বটেই। তাই ক্রেতার মনে প্রশ্ন তৈরি হয়। যার ফলে বাণিজ্যিক ভাবে এটা আলোর মুখ দেখে না ।

তবে আশার খবর এই যে ২০১৮ সালের শুরুর দিক থেকে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত গবেষণায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এএফএম জামাল উদ্দিন।

আধুনিক এই পদ্ধতিতে মুখবন্ধ স্বচ্ছ বালতিতে স্পিরুলিনার চাষ করা হয়। সাদা ড্রাম বা কন্টেইনার পাইপের মাধ্যমে একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত।ড্রামের ভেতরের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নানা উপাদান মিশ্রিত পানির দ্রবণ। যেখানে সমুদ্রের পানির মত ড্রামের ভেতরের পানি চলমান রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ব্লোয়ার মেশিন। আর এর মধ্যেই উৎপাদিত হচ্ছে স্পিরুলনা।

ড. উদ্দিন বলেন, "আমরা চার ফুট উচ্চতা ও তিন ফুট ব্যাসসম্পন্ন ৯৬টি ফুডগ্রেডেড ড্রাম ব্যবহার করেছি। প্রতিটি ড্রামে ২৫০ লিটার পানিতে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, ইউরিয়া, মিউরেট অব পটাশ (এমওপি), ম্যাগনেসিয়াম সালফেট নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে দ্রবণ প্রস্তুত করেছি। এই দ্রবণ থেকে স্পিরুলিনা প্রয়োজনীয় সব খাদ্য নিতে পারবে"।

এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিন জার্নালে জানান বায়ু দূষণ রোধে তার নেতৃত্বে একদল গবেষক নগরবাসীর ইনডোর প্লান্টের চাহিদা পূরণে স্পিরুলিনা মডেল তৈরি করেছেন। সালোকসংশ্লেষণে সক্ষম স্পিরুলিনার খাবার হবে ঘরের বাতাস তথা কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং শক্তির উৎস হিসেবে সূর্যের আলোর পরিবর্তে এলইডি লাইট থাকবে। তিনি জানান যে একটি ছোট আকারের কাচের পাত্রের মধ্যে ১ লিটার পরিমাণ পানি ও স্পিরুনিলা থাকলে এটা ২০টা ইনডোর প্লান্টের সমান কার্বন-ডাই অক্সাইড খায়। এতে অনেক বেশি স্পিরুলিনা তৈরি হয়, যা ১৫ দিন পর পর খাওয়ার জন্য উত্তোলন করা যায়। ফলে স্পিরুলিনা এয়ার পিউরিফায়ারের মাধ্যমে একই সঙ্গে অল্প স্থানে বায়ু পরিষ্কার এবং আমাদের শরীরের জন্য সুপার ফুড পাওয়া সম্ভব।এবার স্পিরুলিনা সম্পর্কে কিছু মজার তথ্য জানা যাক।

প্রশ্ন জাগতে পারে এই নীলাভ সবুজ শৈবালটির নাম স্পিরুলিনা হলো কেনো? স্পিরুলিনা শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ' Helix' অথবা 'Spiral' হতে এসেছে। *Arthrospira platensis* এর গঠনে ফিলামেন্ট এর প্রকৃতি spiral বা helical হওয়ায় একে স্পিরুলিনা বলা হয়।
পানিতে থাকা এই শৈবাল খেয়েই সামুদ্রিক কচ্ছপ ২০০ বছর জীবনধারণ করে। স্পিরুলিনা উচ্চমাত্রায় পুষ্টিসমৃদ্ধ হওয়ায় স্পেসশিপ এ নভোচারীরা নিয়মিত স্পিরুলিনা

আমরা জানি সব কিছুরই ভালো - খারাপ উভয় দিক থাকে। অসংখ্য উপকারী দিক থাকা সত্ত্বেও এই স্পিরুলিনা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া গ্রহণ করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। স্পিরুলিনা চাষের সময় এটি হেভি মেটাল দ্বারা দূষিত হতে পারে যা মানুষের লিভারের জন্যে ক্ষতিকারক। এছাড়া গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে এই শৈবাল কতটা উপযোগী সেটি নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত গবেষণা হয় নি। পাশাপাশি এটি Auto immune disease যেমন Lupus, Multiple Sclerosis এর ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

তথ্যসূত্র:

BBC বাংলা

বাংলাদেশ প্রতিদিন

Wikipedia

WebMD.Com

MedEx.Com

Sciencedirect.Com

কিমিয়া নাহার খুশবু

ব্যাচ ৮১

কৃষি অনুষদ

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

স্কুল থেকে স্কুল
ক্যাম্পেইনের মজার এক অভিজ্ঞতা

আগে কখনও ক্যাম্পেইনে কোনো স্কুল বা কলেজে যাওয়া হয়নি। তাই জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের ক্যাম্পেইনে ঢাকার কিছু স্কুল কলেজে যাবো ভাবতেই অনেক আনন্দ লাগছিল। যখন যাত্রা শুরু করলাম সিনিয়র ভাই আর সিনিয়র আপুদের মধ্যে আমি একই জুনিয়র। তো ভাবলাম আমার জন্য এই ক্যাম্পেইন বোরিং হতে পারে। কিন্তু যেতে যেতে বুঝতে পারলাম আমাদের সাথের আপু ও ভাইরা বেশ মজাদার মানুষ । বোরিং ফিল হওয়ার কোনো পথই ছিলো না।

প্রথমে আমরা বিদ্যালয়ে গেলাম, মাননীয় হেডমাস্টার ফোনে কথা বলে আর বলে!! আমাদের কিছু বলার কোনো সময়ই দিলো না। আমরা দাড়িয়ে দাড়িয়ে অপেক্ষা করলাম স্যারের কথা শেষ হওয়ার জন্য। স্যারের কথা শেষ হতেই বললেন তোমাদের কি দরকার? আমরা বললাম জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড থেকে ক্যাম্পেইন এ এসেছি। সাথে সাথে স্যার বললো এখন ক্লাস হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে ওদের অনেক পড়াশোনার চাপ,রমজানের দীর্ঘ ছুটি আরও ব্লা ব্লা ব্লা..... মানে উনার এক্সকিউজ এর কোনো শেষ নেই আমরা বের হয়ে চলে গেলাম। আমরা এখানে সফল হলাম না।

তারপর আরেকটা স্কুলে গেলাম সেখানে ম্যাডামের এক মিনিটে তিনবার মুড সুইং হয়। আরে শুনেই রেগে যাবেন না! বলছি কিভাবে,একটু ধৈর্য্য ধরুন। ম্যাডাম প্রথমে বলে তোমরা কারা ! আমাদের কথা বলার পর, ম্যাম বলে এতে কি টাকা পাওয়া যায়! আমাদের কথা বলার পর, ম্যাম কোমল গলায় বলে এদের এট্টু চায়ের ব্যবস্থা করো!! তারপর আমরা চা খেয়ে চলে আসলাম আর ভাবলাম একটা মানুষের এতো বেশি মুড সুইং কিভাবে হয়!!!

এরপরের স্কুলে যখন গেলাম তখন সবচেয়ে মজার কাহিনীটা দেখলাম। সেখানে দেখি পুরুষ মানুষেরও মুড সুইং হলো !! উনার আলোচনা যদি লিখি তাহলে ছোট খাটো একটা গল্প হয়ে যাবে তাই লিখলাম না।

তারপর গেলুম অন্য একটি স্কুলে, সেখানে গিয়ে গেইটে পারমিশনের জন্য ১৫ মিনিট অপেক্ষা করলাম এরমধ্যেই কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চিঠি লিফলেট বিতরণ করলাম অবশেষে একটু অনুমতি পেলুম ভেতরে প্রবেশ করতে। যখন গেইটটা পার হলাম আমাদের তিনজনের চৌদ্দ গোষ্ঠীর রিপোর্ট পেশ করে এট্টু ভেতরে যেতেই দেখে বেকায়দা সুন্দরী আপু আছে আমাদের জন্য। আমাদের দেখেই বললো তোমরা তো মেইনলি মার্কেটিং এর জন্য এসেছো!! একথা শুনেই আমরা কিছু বলতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু মহামান্য ভদ্র মহিলা আমাদের কোনো সুযোগই দিলেন না। তিনি বললেন আমি এমনভাবে মার্কেটিং করব যে তোমাদের আর কিছু করাই লাগবে না, তোমরা এখন যাও!! আপু বললো আপনার নাম্বারটা যদি দিতেন তাহলে আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারতাম। বেকায়দা ভদ্রমহিলা বললো নাম্বার তো দেওয়া যাবে না। এমন ভাব নিয়ে বললো যেন তার....
আমাদের পুরো মুডটাই নষ্ট করে দিলো। তারপর রাগে-দুঃখে ক্ষোভে চলে আসলাম আরেকটি কলেজে। কর্তৃপক্ষের ব্যবহার ছিল অমায়িক। তাদের দেখে মনে হলো এখান থেকে বাচ্চারা কিছু শিখতে পারবে।

তারপর আরও অনেক স্কুল কলেজে গেলুম কিন্তু দুপুরে খাওয়ার পর রাস্তা দিয়ে হাটতেছিলাম। হঠাৎ ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা স্কুলের নাম। নাম দেখেই ঐ পথ ধরে শাহরিয়ার ভাইয়ের নেতৃত্বে এগিয়ে গেলুম কিন্তু স্কুল আর খুঁজে পায় না অবশেষে রাবেয়া আপু বললো, শুধু শুধু হাঁটা হচ্ছে এখানে কোনো স্কুল নেই তারপরও অদম্য শাহরিয়ার ভাই এগিয়ে গেলেন আমরাও তাকে অনুসরণ করলাম। অবশেষে পেলুম সেই স্কুল যেখানে স্যার ম্যাম সবাই খুবই আন্তরিক। হেডস্যার তো আমাদের সাথে অলমোস্ট ৩০ মিনিট গল্পই করলেন। আমাদের নাস্তা করালেন। স্যার এর নিজের লাইফ থেকে অনেক কিছুই শেয়ার করলেন, উপদেশ দিলেন তারপর মিজান স্যার আমাদের কাছ থেকে সবকিছু ডিটেইলস জেনে নিলেন। সবশেষে স্যার ম্যাম এর সাথে ছবি তুললাম। বের হয়ে এসে রাবেয়া আপু বললো আমার জন্যই দিনের সবচেয়ে সফল একটা ক্যাম্পেইন হলো, অথচ তিনিই কিছুক্ষণ আগে দিনের সবচেয়ে লস প্রজেক্ট বলছিল।

যাইহোক, এতো গল্প লিখার জন্য লিখা, কিন্তু আমার জন্য অভিজ্ঞতাটা ছিল অসাধারণ যা লিখে বা বলে বা ভাষায় প্রকাশ করে বোঝানো অসম্ভব !!!

মোঃ মফিজ শেখ

ব্যাচঃ ৮১
কৃষি অনুষদ
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

রিফাত আর ফাইজা কলেজে উঠেছে এবার। নতুন কলেজ, নতুন পরিবেশ সাথে বয়ঃসন্ধির রঙিন চশমা চোখে দুজনারই। একদিন লাইব্রেরি রুমের দিকে যেতে যেতে দুজনারই চোখাচোখি হয়ে গেল। কেমন একটা অনুভূতি হলো দুজনারই। কেমন যেন চারিদিকে সবকিছুতে একটা চাঞ্চল্য দেখতে পাচ্ছে ওরা। দুজনের মনে একই প্রশ্ন আমার কেন এমন হচ্ছে?? ক্লাসেও মাঝে মাঝে চোখাচোখি হচ্ছে তাদের। দুজনেই ভাবছে একটু যদি কথা বলতে পারতাম। যাই হোক কলেজ ছুটি হলে রিফাত প্রতিদিন সবার আগে বেরোতো ক্লাস থেকে আজ তেমনটা হলো না। ফাইজাও পরে বের হলো। ফাইজা রুম থেকে বের হবে এমন সময় রিফাত বললো, "হ্যালো" এভাবেই আলাপনের শুরুটা। এরপর কয়েকদিন পর বসন্ত উৎসব কলেজে। রিফাত ভাবলো আজকে মনের কথাটা বলেই ফেলবো। ফাইজাও সুন্দর করে সেজে বাসন্তী শাড়িতে কলেজে গেলো এদিকে রিফাত পড়েছে লাল পাঞ্জাবি সাথে সাদা পায়জামা। কলেজের গেইট পেরোতেই রিফাত ফাইজাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারছিলো না। ফাইজাও আড় চোখে তাকাচ্ছিলো। দুজনের মনের মধ্যে যেন মেঘনার জলরাশি বয়ে চলেছে। একটু কাছে গিয়ে রিফাত ফাইজাকে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো। রিফাত আর কথা না বাড়িয়ে তার মনের কথা রাঙা গোলাপে বলেই ফেললো। ফাইজারও আনন্দ ধরে না। ঘটনাটার শুরু এখানেই। তারপরে রিফাতের সবকিছু ফাইজার ভালো লাগতে শুরু করে আবার উল্টোটাও। বিবেচনাহীন কাজগুলো তাদের কাছে খারাপ লাগে না। কিন্তু এ আর বেশিদিন টিকলো না। আস্তে আস্তে তাদের ভালোবাসাটা ফিকে হতে শুরু করে। দুজনার দুজনের প্রতি আকর্ষণ কমতে শুরু করে। নিজেদের অভাব অভিযোগের পাল্লাটা বাড়তে থাকে । একসময় ফাইজা-রিফাতের প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটে। রিফাতের আজকাল কিছুই ভালোলাগে না। সারাদিন কারণে অকারণে মন খারাপ করে থাকে। আর সারাদিন বলে যাকে আমি হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ভালোবাসলাম সেই আমাকে ছেড়ে চলে গেলো ?? নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেছে তার। এখন সবার কাছে সে ডিপ্রেসড বলে পরিচয় দেয় নিজেকে। ছেলের এই মানসিক অবস্থা দেখে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন তার বাবা আজমল সাহেব।

সায়েন্স নিয়ে লিখতে যেয়ে উপন্যাস রচনা করে ফেললাম??
না টুইস্ট টা এখান থেকেই শুরু। সহজভাবে বুঝাতে দুটো কাল্পনিক চরিত্রের আশ্রয় নিয়েছি মাত্র। প্রেম ভালোবাসা চিরায়ত সেটা হতে পারে প্রেমিক প্রেমিকার, পিতা পুত্র, মা-ছেলে শত সহস্র রকমের। যাকগে সে কথা। আসি প্রথম কথায়, প্রেম ভালোবাসা জিনিসটা আসে কই থেকে?

যাদের জীববিজ্ঞান নিয়ে কিছুটা জানাশোনা আছে তারা জানেন যে ভালোবাসা, ঘৃণার উৎপত্তি অগ্রমস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে। এই হাইপোথ্যালামাসের নিচেই পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের অবস্থান। যেখানে প্রতিনিয়ত চলে হরমোন নিঃসরণের খেলা। রিফাত ফাইজার প্রথম ভালোলাগার মতো প্রেমের প্রথম পর্যায়ে হাইপোথ্যালামাসের সেন্টার থেকে নিঃসৃত হয় 1.Adrenalin, 2. Dopamine, 3.Seratonin হরমোন। আর এদের কার্যকারিতায় ভালো লাগতে শুরু করে একে অপরকে, তারা চলে যায় অন্য এক কল্পনার জগতে। স্বাভাবিক চোখে হরমোনগুলোকে কত্ত ভালো মনে হতে পারে। আসলে ব্যাপারটা পুরাই উল্টা। এই হরমোনগুলোই আবার আপনার লজিকাল সেন্টার কে অবদমিত করে আপনার চিন্তা ভাবনার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এতে নিজের প্রিয়তমার বিবেচনাহীন কাজকর্মও আপনার ভালো লাগতে শুরু করবে। কিন্ত রিফাত ফাইজার মতো আস্তে আস্তে প্রেম ফিকে হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা তাহলে কি?

যাওয়ার ঘটনাটা তাহলে কি?
আসলে ব্রেনের নিউরনের বৈশিষ্ট্য এমন যে একই জিনিস বারবার ঘটলে তার প্রতি সেনসিটিভিটি কমিয়ে দেয় ব্রেইন। তারপরেই শুরু হয় একে অপরের প্রতি অভিযোগের পালা। আগে কতো ভালো ছিলাম এখন কেন জানি আর আগের মতো লাগেনা ব্যস সম্পর্কের চির এখান থেকেই। এই নিউরনের সেনসিটিভিটি হরমোনগুলোর প্রতি কমে গেলেই একসময় প্রেমে বিচ্ছেদ (ব্যতিক্রম পরে বলছি)। তারপরেই আসে রিফাতের মতো ডিপ্রেশন পর্যায়। আগেই বলে রাখি আমরা প্রতিনিয়ত কারণ ছাড়াই ডিপ্রেসড বলে যে চেঁচাই এটা আসলে সুখজনিত অবসাদ। যখন সবকিছু পেয়ে আর কিছু পাওয়ার থাকে না তখনই এর সৃষ্টি। তবে ডিপ্রেশনের ভয়াবহ পরিণতি হলো 'ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন' যার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। মেডিকেলের ভাষায় ডিপ্রেশনেকে বলা হয়,
"Depression is another dimension of life"

যাক সে কথা। এবার আসি এই ডিপ্রেশন আসে কোথা থেকে? এর সঠিক কারণ আজও অস্পষ্ট। তবে কিছু অনুকল্প থেকে জানা যায়, নরমাল মুড মেইনটেন্যান্স এর জন্য Adrenalin Neurotransmiter পর্যাপ্ত পরিমাণে রিলিজ প্রয়োজন। আর যখনই Adrenalin Neurotransmiter , Dopamin, Seratonin এর নিঃসরণ কমে যায় তখনই ডিপ্রেশনের সৃষ্টি।

এবার আসি রিফাতের হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা কথাটায়। আসলে ভালোবাসা কি হৃদয় থেকে আসে? উত্তর হচ্ছে না। হৃদয় বা হার্টের কাজ রক্ত পাম্প করা, তার ভালোবাসার সময় নাই। কাজটি হাইপোথ্যালামাসের। তাইলে প্রেম ভালবাসায় হৃদয়ের কাজ কী আসুন ব্যাখ্যা করি।
ব্যাপারটি রিফাতদের বিচ্ছেদের মধ্যে লুকিয়ে আছে। এরকম অবস্থাকে 'ব্রোকেন হার্ট সিন্ড্রম' বলে। যখন আপনি মানসিকভাবে ভীত, ব্যাথাগ্রস্থ তখন আপনার পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের পোস্টেরিয়র পার্ট থেকে Adrenalin নিঃসৃত হতে থাকে। যা আপনার মানসিক প্রশান্তি আনয়নে সহায়ক। আর এই Adrenalin এর একটা কাজ হলো হার্ট রেট বাড়িয়ে দেওয়া। Adrenalin অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হতে থাকলে হার্ট রেটও বেড়ে যায়। কিন্ত একটা সময় সেই তালটা বজায় রাখতে পারেনা। কারণ আমরা জানি আমাদের দেহে গ্লুকোজের স্ববাত শ্বসনে যে ATP উৎপন্ন হয় তাই দিয়ে হার্ট চলে। কিন্তু একসময় Adrenalin ক্ষরণের সাথে হার্টের তাল রাখতে গ্লুকোজের অবাত শ্বসনও শুরু হয় আর বাই প্রোডাক্ট ল্যাকটিক এসিড (খুবই দুর্বল) তৈরি হয়। এই ল্যাকটিক এসিড হার্টে জমা হতে হতে একসময় Burning Sensation হয় যেটা ছ্যাঁকা খাওয়া বলে আপনারা জানেন এইখানেই হৃদয়ের কারসাজি।
আর বলবেন যে অনেক প্রেম তো লাস্টিং করে। হ্যাঁ উপরে বলেছিলাম ব্যতিক্রমের কথা। এইখানেই আসে ট্রু লাভ হরমোন Oxytocin. এই হরমোনটার জন্য লজিকালি বিচার করা শুরু করে প্রেমিক প্রেমিকা। এর বিস্তৃতি ব্যাপক। তবে মজার বিষয় পুরুষদের থেকে মেয়েদের ক্ষেত্রে Oxytocin বেশি কাজ করে।

এভাবেই প্রেম-ভালোবাসা থেকে শুরু করে জীবনের যাবতীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে হরমোনের ক্রিয়ায়।

সিদরাতুল মুনতাহা শিশির
ব্যাচ: ৮১
কৃষি অনুষদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

শয়তানের নিঃশ্বাস

শহরের সরু রাস্তা। রিকশায় চড়লেন। রিকশাওয়ালা মামা একটা কাগজের টুকরো দিয়ে ওষুধের নাম/ঠিকানা পড়ে দিতে বললেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন আপনার কাছে থাকা টাকা পয়সা, গহনা চুরি হয়ে গেছে আপনি টেরও পাননি। মনে হচ্ছে কিছুটা সময় আপনি অন্য কোথাও হারিয়ে গিয়েছিলেন। শহরজুড়ে এরকম ঘটনা অহরহ বাড়তে থাকলো। একদল মানুষ একে হিপনোটাইজেশন, একদল ব্ল্যাক ম্যাজিক বলে চালিয়ে দিলো। হ্যাঁ ঘটনাটা রহস্যজনক বটে। এখন থেকে পাঁচ সাত বছর আগ থেকে ঢাকা-চট্টগ্রামে এইরকম দু একটা ঘটনা শুনতে পাওয়া যেতো। সম্প্রতি সারাদেশে এই ধরনের ঘটনা অহরহ দেখা যাচ্ছে। সেই সূত্র ধরেই লিখছি।

ধুতুরা গাছের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। হেমলকের বিষ নামটা একটু ইংরেজি ভাবের দেখে সাহিত্যে স্থান পেলেও পথে ঘাটে পড়ে থাকা ধুতুরা সে তুলনায় অবহেলিত। যাইহোক এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার পেছনের কারণও ওই ধুতুরা গণের একটা উদ্ভিদ। সেই বিচ্ছু উদ্ভিদের নামটা কিন্তু চমৎকার "the angel's trumpet" বা “দেবদূতের বাঁশি”। যাইহোক বৈজ্ঞানিক নাম *Brugmansia arborea* । আদর করে ডাকা হয় Borrachero.

দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া চিনেন তো? হ্যাঁ সেই কুখ্যাত মাদকের রাজধানী। সেই কলম্বিয়াতে Borrachero এর সংসার। এই গাছের ফুল কিন্তু অনেক সুন্দর। এই যে ফুলটি তাঁর উজ্জ্বল রঙ আর সৌন্দর্য্য দিয়েই কিন্তু মানুষকে মুগ্ধ করে টেনে নেয় তাঁর কোলের কাছে। শুধু তো তাইই নয় সেই সাথে তাঁর নামটিও যে ভারী সুন্দর যেটি আগে বললাম “দেবদূতের বাঁশি” ইংরেজী নাম “এঞ্জেলস ট্রাম্পেট”। কিন্তু এই স্বর্গীয় বাঁশিতে না আছে সুমিষ্ট কোন মধুর সুর না আছে নিদেনপক্ষে কোন স্বর্গীয় সুগন্ধি! তাঁর বদলে এতে আছে কিনা তিনটি ভয়ংকর বিষাক্ত উপাদান যা হলো আয়ট্রোপাইন, হায়োসাইসামিন আর স্কোপোলামাইন। আর এই স্কোপোলামাইন এতটাই বিষাক্ত যে বিশেষজ্ঞরা এর নাম দিয়েছে "Devils Breath" বা শয়তানের নিঃশ্বাস। আর এই Devils Breath বা “শয়তানের নিঃশ্বাস” এর নিঃশ্বাসে মানুষ অসুস্থ হয়ে পরে আর সময়মত চিকিৎসা না নিলে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। এবার কলম্বিয়ানদের নাম তো রাখতে হবে । তারা এই ফুলের বীজ থেকে তৈরি করে Scopolamine নামের ড্রাগ বা মাদক। আর এই মাদক কারো শরীরে প্রবেশ করলে সে নিজের ইচ্ছায় কোনোকিছু করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; অনেকটা জম্বি হয়ে যায়।

ছিনতাইকারীরা এই মাদকের খুবই সামান্য পরিমাণ অংশ কোনো কাগজে লিখে কাউকে (টার্গেট করে) পড়তে দেয়। যখনই কেউ কাগজটি পড়ার জন্য হাতে নেয় তখনই কাগজে থাকা মাদকটি চামড়ায় লেগে চামড়ার মাধ্যমে তার শরীরে ঢুকে যায় এবং মাদকটি তার কাজ শুরু করে দেয়। যে কাগজটি পড়ার জন্য হাতে নেয় তার নিজের ইচ্ছায় কোনোকিছু করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন তাকে যা করতে বলা হয় সে সেসব কিছুই করে। টাকাপয়সা, গয়না, কোনো কিছুর পাসওয়ার্ড যা যা জিজ্ঞেস করে সব বলে দেয় নিজের অজান্তেই।

শুধু কাগজ না এমনকি খাবারের মাধ্যমেও এই মাদক আপনার শরীরে কেউ প্রবেশ করাতে পারে। আপনি নিজের অজান্তেই নিজের সবকিছু হারাতে পারেন।

তবে এইটার মেডিকেল সেক্টরে ব্যবহার অনেক। সময় স্বল্পতায় লিখতে পারলাম না। আশা করি আপনারা আর কালাযাদু ভাববেন না। থাকুন ফুলের সাথে।

সিদরাতুল মুনতাহা শিশির

ব্যাচ: ৮১
কৃষি অনুষদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

"বিলুপ্তির পথে একসময়ের জনপ্রিয় ফল"

এ যেন গাছে ধরা এক জিলাপি। পাকা অবস্থায় দেখতে লাল জিলাপির মত পেঁচানো। একসময় যা ছিল অভাবে মানুষের নিত্যদিনের আহার। অঞ্চলভেদে রয়েছে এর ভিন্ন ভিন্ন নাম। কেউ বলে 'খইয়া বাবলা' কেউ বলে 'খৈ বাবলা' আবার অনেকেই 'জিলাপি ফল' নামেও ডেকে থাকে। এর ফলের রং কাঁচা অবস্থায় সবুজ কিন্তু পেকে গেলে হয় লাল। লাল হয়ে যাওয়া সুস্বাদু ফল যেমন পাখির প্রিয় খাবার তেমনি করে মানুষেরও ছিল প্রিয়।

খইয়া বাবলা বা 'খৈ বাবলা' অথবা 'জিলাপি ফল' (বৈজ্ঞানিক নাম: *Pithecellobium dulce*) হচ্ছে Fabaceae পরিবারের *Pithecellobium* গণের একটি সপুষ্পক বৃক্ষ।

এ গাছের দেহ সুন্দর, অনেকটা বড় আম গাছের মতো । গাছ কেটে ফেললেও এর গোড়া থেকে দ্রুত নতুন ডাল গজিয়ে যায়। চারটি উপপত্র পাতার গোঁড়ায় কাটা থাকে। পুরনো পাতা ঝরে দ্রুত নতুন পাতা গজায়। পাতা দেখতে অনেকটা কাঞ্চনের পাতার মত। সাধারণত খইয়া গাছে ফাল্গুন মাসে ফুল ফোটে এবং চৈত্র –বৈশাখ মাসে ফল পাকে। এ গাছের ফুল দেখতে খুব ছোট এবং এর বীজ দেখতে অনেকটা শিমের বীজের মত এবং রং অনেকটা কালো। এর ফল দেখতে জিলাপির মতো পেঁচানো। ফলে ৫-১০ টি বীজ থাকে। পাকার পরে ফল ফেটে ভিতরে থেকে হলুদাভ সাদা মাংশ বীজ বেরিয়ে পরে। এর ফল মিষ্টি ও সুস্বাদু হয়। আমেরিকা, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, বাংলাদেশ ও ভারতে এই উদ্ভিদ দেখা যায়। এই ফলটি আঞ্চলিকভাবে পছন্দনীয় হলেও দেশব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে এর প্রচলন নেই কোথাও।

জিলাপি ফলের মধ্যে রয়েছে অবাক করা স্বাস্থ্য উপকারিতা:

জিলাপি ফলের উপকারিতার মধ্যে রয়েছে

–হাড় এবং পেশী শক্তিশালী করে।

–পাশাপাশি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা।

–এ গাছের ছাল আমাশয়, ডায়েরিয়া ও যক্ষারোগের জন্য উপকারি।

–এর বীজ আলসারের উপশম করে।

–কফ নিঃসরণ ও পিত্তাশয়ের রোগে ব্যবহৃত হয় এ গাছের পাতা।

কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে এই খইয়া বাবলা গাছ। একসময় নড়াইল জেলা ও এর আশেপাশের স্থানীয় নদী, খাল, বিলের পাশে প্রচুর দেখা গেলেও এখন আর সচরাচর এর দেখা পাওয়া যায় না। এই গাছের প্রচলন ধীরে ধীরে কমতে থাকায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো এই ফলটি আর চিনবে না। এই গাছ এবং ফল বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করে বাজারজাত করা গেলে, নতুন করে একটি সুস্বাদু ঔষধি ফল বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন অনেকেই। শুধু পাখি নয় মানুষের কাছেও সুস্বাদু ফল হিসেবে সমাদৃত হতে পারে এই ফল।

(সূত্র: উইকিপিডিয়া, ডিবিসি নিউজ)

শিরিন আক্তার তমা

ব্যাচ ৮১

কৃষি অনুষদ

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

"জীববিজ্ঞান"

নামের সাথেই কেমন একটা মায়া কাজ করে।জীবনের প্রথম দেখা স্বপ্নকে হয়তো আজো লালন করছি মনের এককোণে।

সেখান থেকেই জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের সাথে কাজ করার তীব্র ইচ্ছা জাগে।এছাড়া কলেজ জীবনে অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়ার সুযোগ হয়েছিল।তাই অলিম্পিয়াডের সাথে আবারো কাজ করার সুযোগ টা আর হাত ছাড়া করতে পারলাম না। ২-৩টা সেশন করার পরই বুঝতে পারলাম একটা প্রোগ্রাম রান করার পেছনে অনেকের পরিশ্রম থাকে।তিনটা সেগমেন্টে কাজ ভাগ করা হলো: এক্সাম টিম,ডিসিপ্লিন টিম এবং ফুড টিম। এক্সাম টিমের খুব ডিমান্ড দেখলাম,সবাই হুড়মুড়িয়ে এক্সাম টিমে যাচ্ছে,আমিও তাদেরকে আরেকটু জায়গা করে দিয়ে চলে এলাম বাকি ২ টিমের কাছে। ফুড টিমের রাতে কাজ করতে হবে ভেবে ডিসিপ্লিনের দিকেই ছুটলাম।সাথে অনেক এডভান্টেজ ভেবে নিলাম,সবাইকে চিনতে পারবো,বেশি এক্টিভিটি শো করা যাবে,গার্ডিয়ানদের সাথে এবং স্টুডেন্টের সাথে বেশ ভালো একটা সখ্যতা গড়ে তোলা যাবে!! যথারীতি ডিসিপ্লিন টিমের ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করতে হবে সবার আগে, তাই লিডারের কথা মতো ভোর ৬.৩০টায় হাজির। কাজ দেয়া হলো ৪ তলায় ফ্লোর ম্যানেজমেন্টের,যেখানে কিনা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী এক্সাম দিচ্ছিল।তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে এক্সাম হলে পৌঁছালাম।

এক্সাম শেষ হওয়া মাত্র তাদেরকে গাইড করে টিএসসি তে এনে প্রোপারলি বসালাম এবং দায়িত্ব পালন করতে দাঁড়িয়ে গেলাম অডিটেরিয়ামে।

সবচেয়ে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে যখন লাস্ট মোমেন্টে লিডার, গার্ডিয়ান হ্যান্ডেলিং করতে নিচে পাঠায়। দীর্ঘক্ষণ পার হয়ে যাবার পরও বাচ্চারা যখন আসছিলো না তখন চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক।কিন্তু বহিঃপ্রকাশ টা সত্যিই একটু ভীতিকর ছিলো আমাদের জন্য। আর সবথেকে ভালোলাগাটা কাজ করে শেষ মুহূর্তে...

সুমাইয়া জাহান মিমি

ব্যাচ ৮১

কৃষি অনুষদ

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

খাদ্য

আমরা যে সব বস্তু আহার করি তাকে আহার্য সামগ্রী বলে। কিন্তু সকল আহার্য সামগ্রীই খাদ্য নয়। যেমন, ঘাস সেলুলোজ দিয়ে গঠিত হওয়ায় আমাদের পরিপাক নালীতে পাচিত হয় না। ফলে এটি পুষ্টি সহায়ক নয়। সুতরাং সেই সব আহার্য সামগ্রীকেই খাদ্য বলা যাবে, যা দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সহায়ক এবং তাপশক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে। তাই বলা যায়, যে সব আহার্য সামগ্রী গ্রহণ করলে জীবদেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি, শক্তি উৎপাদন,ক্ষয়পূরন হয় ও রোগ প্রতিরোধ করে তাকেই খাদ্য বলে।

আর সেই খাদ্যকেই সকলের মাঝে তুলে ধরতে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে ফুড টিম।খাদ্যকে কেন্দ্র করেই ফুড টিমের সকল কাজ,অন্যান্য টিমের তুলনায় এই কাজটা কষ্টসাধ্য ছিল তারপরেও মনে শান্তি আসে যে আমি এনজাইম, ফুড টিমের একজন সদস্য সবাইকে খাদ্য গ্রহনে সাহায্য করেছি। যদি ফুড টিম এই খাদ্য সবার মাঝে বিলিয়ে না দিত তাহলে কি হতো একবার চিন্তা করে দেখুন তো!!

যথাযথ পুষ্টির অভাবে এক্সাম টিম,শৃঙ্খলা টিম অসুস্থ হয়ে পড়তো, শুধু তাই না অলম্পিয়াডে আসা সবাইকে ফুড টিমে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি বলতে চাই বায়োলজি অলিম্পিয়াডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলটিই ছিল ফুড টিম যাদের সেচ্ছাসেবী কাজের কারনেই এবারের বায়োলজি অলম্পিয়াড এতো সুন্দর ছিল।

মেহেদী হাসান তনয়

ব্যাচ ৮১
কৃষি অনুষদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ফিরে দেখা

Regional Biology Olympiad 2024
Dhaka North

Sher-e-Bangla Agricultural University

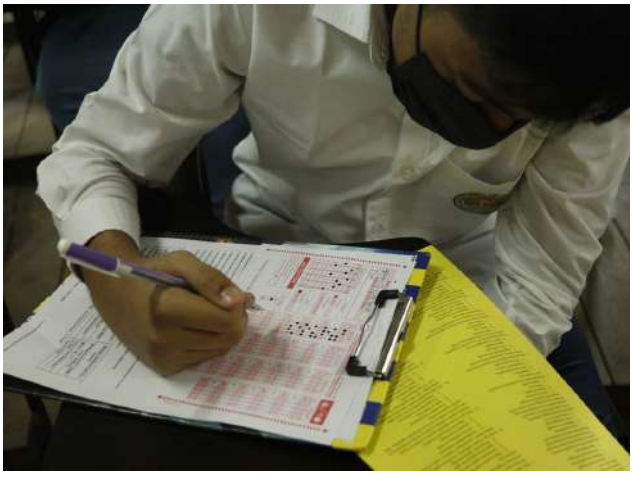

ফিরে দেখা

National Biology Olympiad 2024

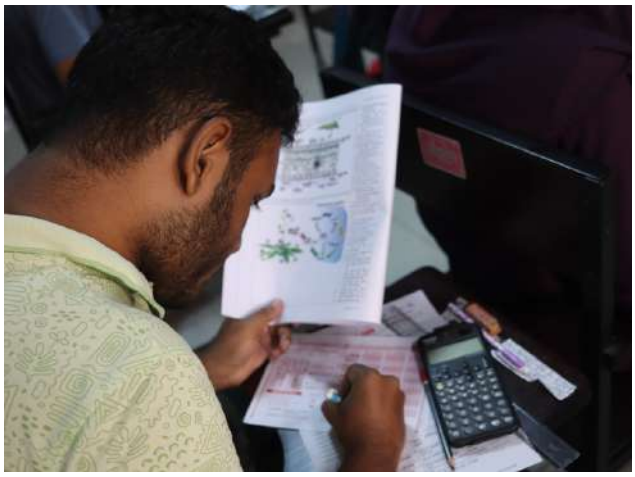

Sher-e-Bangla Agricultural University

চিত্রকল্প

ইসরাত জাহান মীম
কৃষি অনুষদ

মোঃ রবিউল করিম রিফাত
কৃষি অনুষদ

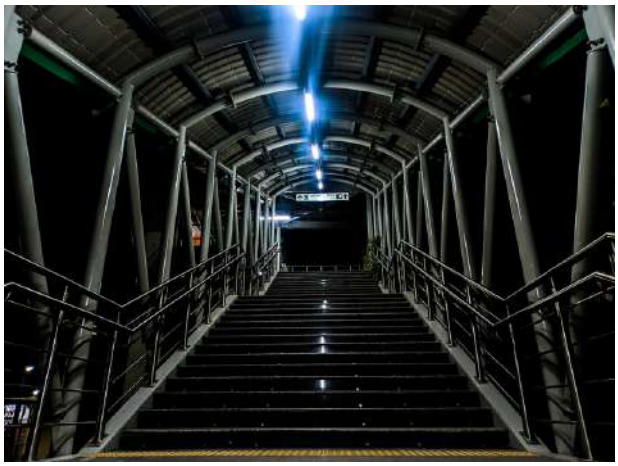

শবনম জেরিন
কৃষি অর্থনীতি অনুষদ

খাদিজা খানম স্বর্ণা
কৃষি অনুষদ

কিমিয়া নাহার খুশবু
কৃষি অনুষদ

রিফা সানজিদা
কৃষি অনুষদ

মুঠোফোনে প্রকৃতি

নাদিয়া আফরোজ অওমি
কৃষি অনুষদ

তাহেরা আলীম অথী
কৃষি অনুষদ

মোঃ নাসিম হোসেন
কৃষি অনুষদ

মোঃ রবিউল করিম রিফাত
কৃষি অনুষদ

সামিয়া আক্তার সুরভী
কৃষি অনুষদ

শবনম জেরিন
কৃষি অর্থনীতি অনুষদ

মোঃ মেহেদী হাসান মীম
কৃষি অনুষদ

তামিম রহমান
কৃষি অনুষদ

অঙ্কন

সুমাইয়া জান্নাত
কৃষি অনুষদ

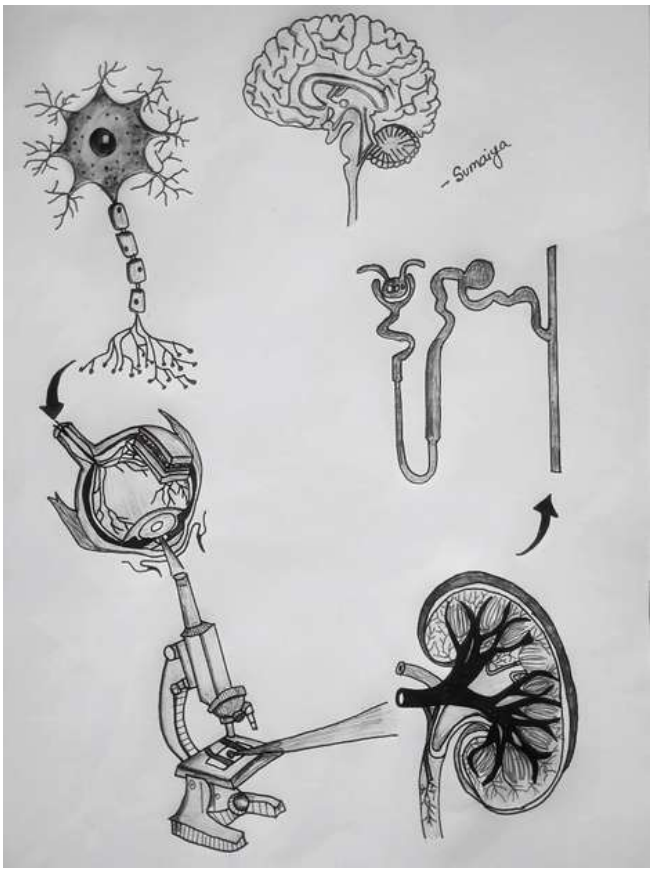

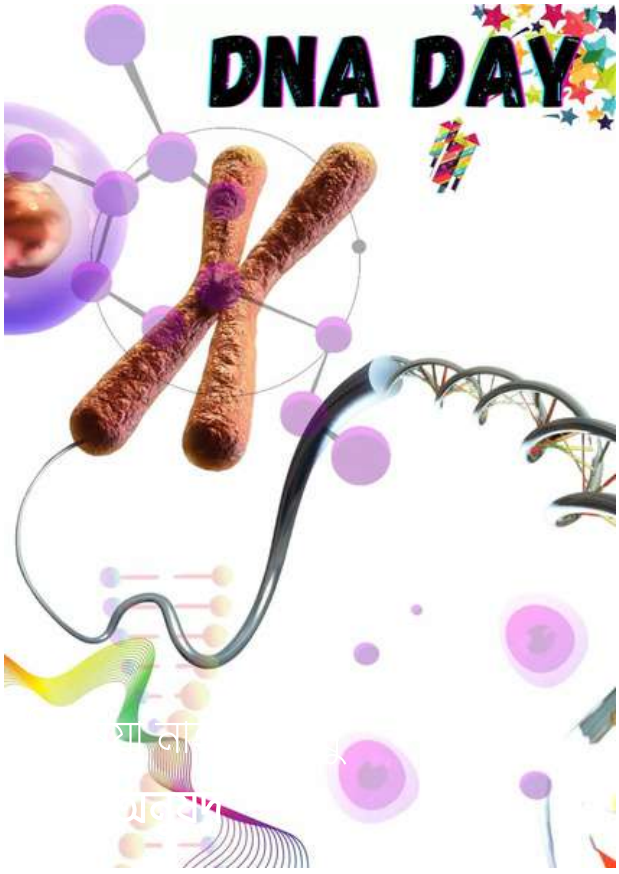

শারমিন আক্তার মীম
কৃষি অনুষদ

জাহিন সুবহা
কৃষি অনুষদ

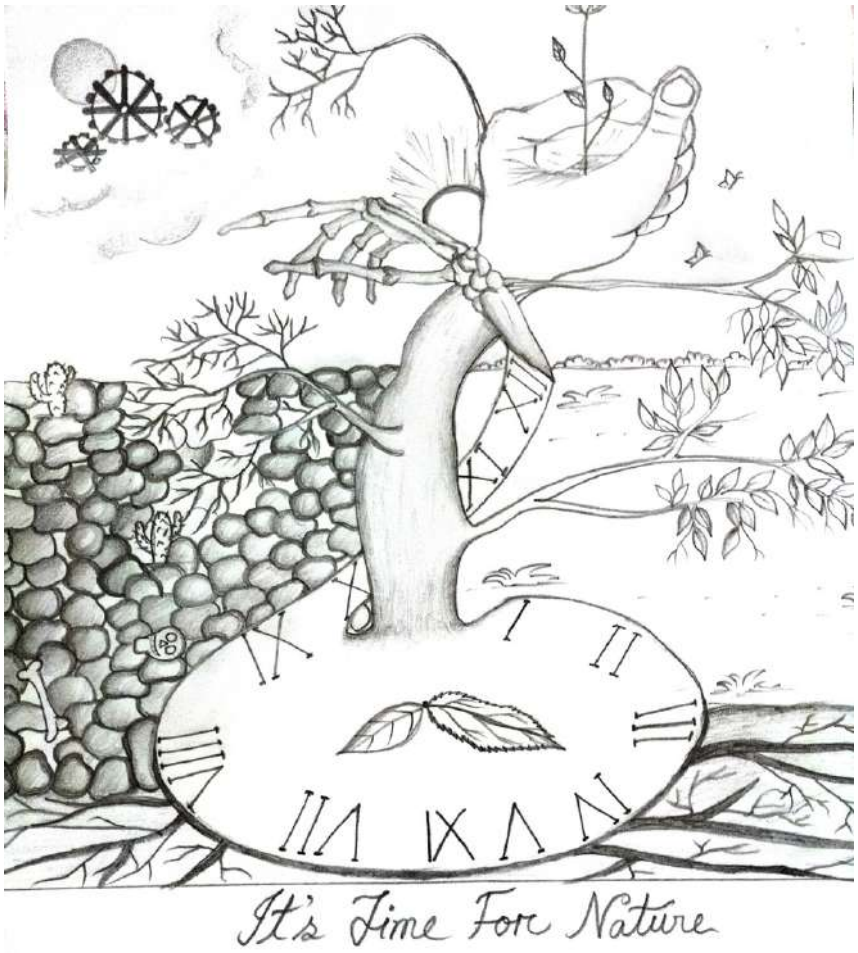

**“বিজ্ঞানের যুগে চাই, বিজ্ঞানী-মন,
সচেতনে খুঁজে পায়, আলোর ভুবন।”**

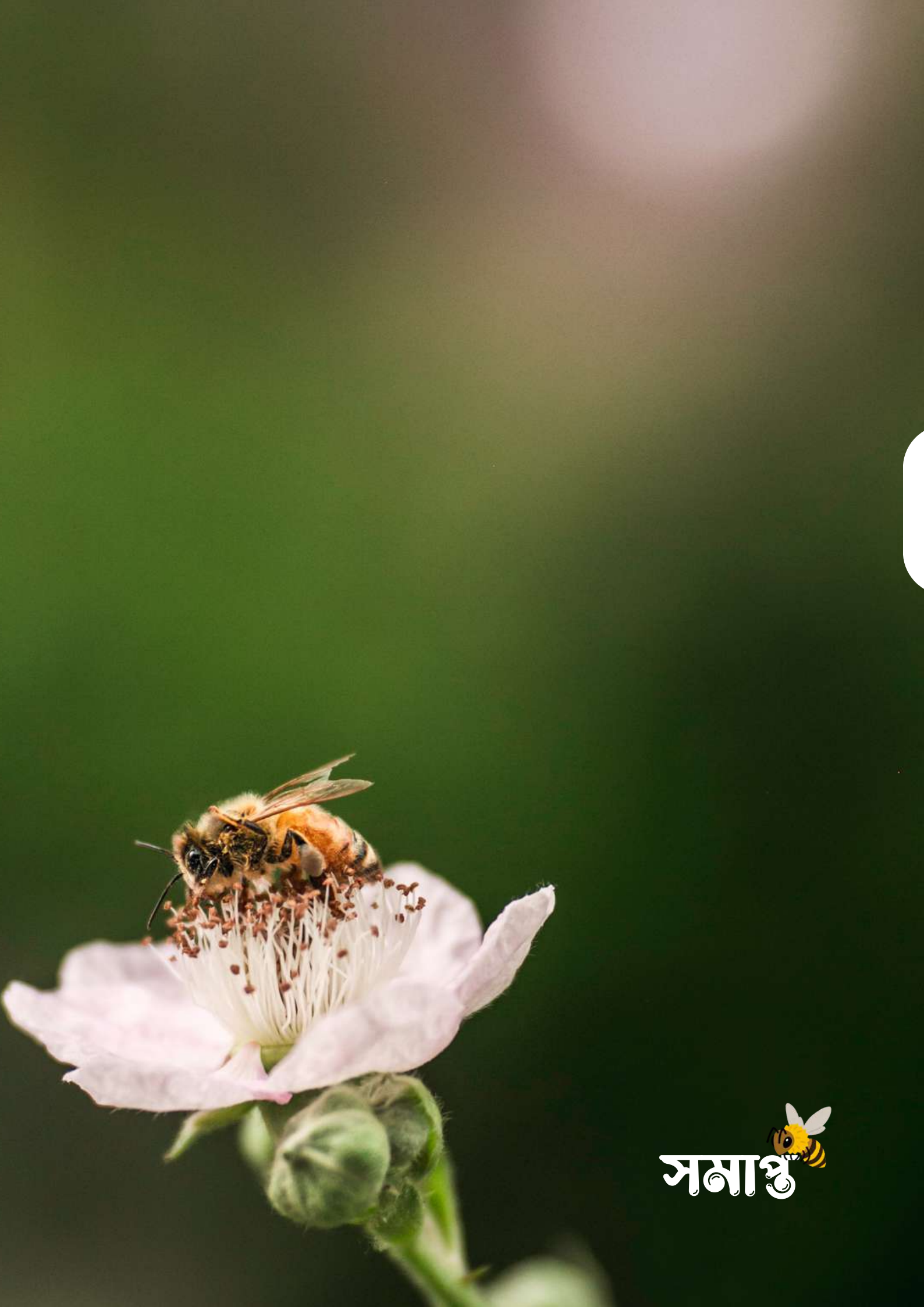
সমাপ্ত